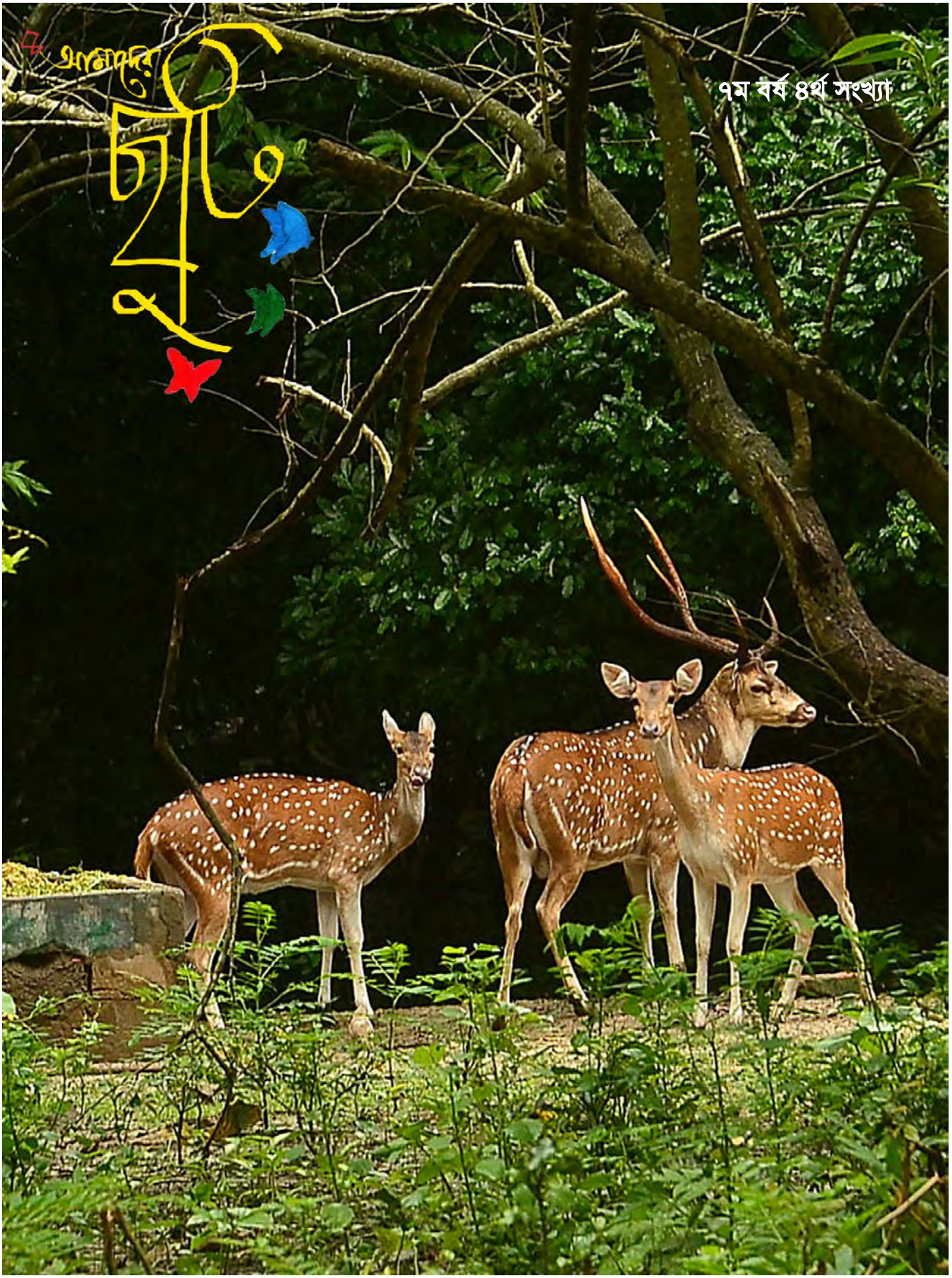

বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে চিতল হরিণ পরিবার - আলোকচিত্রী- শ্রী অরিজিত কর

র

আমাদের ছুটি ইচ্ছে হলেই...

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

~ ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২৪ ~

খুব উঁচুতে উঠতে পারি না পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে বিহারীনাথ পাহাড়ের কোলে বনঝোপের মাঝে একটা চ্যাপ্টা পাথরে বসে থাকি একা একা।

সব বনেরই একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। আর তা একেবারে তার বুকের ভেতরে না গেলে অনুভব করা যায় না।

কেমন নির্জন একটা বেলা। বড় বড় গাছের পাতায় পাতায় শনশন শব্দ। ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে শীতের নরম রোদের রেখা। পাখিদের ডাক দিয়ে যাওয়া। ঠান্ডাটা খুব লাগছে না। বোধহয় খানিকটা হেঁটে উঠে আসার জন্য।

ভাবছিলাম। ওই যে উইটিপির পাশ দিয়ে পায়ে চলার পথটা পাথর বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়েছে ওপথে বিভূতিভূষণ কোনওদিন হেঁটেছিলেন কিনা।

বাড়ি ফিরে অনেক খুঁজেও বইয়ে পেলাম না। অথচ তখন বেশ অনুভব হচ্ছিল। হয়ত যাননি, অথবা গিয়েছিলেনই বা – আমার কল্পনায়।

এই জন্যই বেড়াই হয়তো। যেটুকু পারি। প্রকৃতিই কল্পনাকে আপন বলে দুচোখে তুলে দেয় আমার।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"পাঠক, যদি কখন রাজগৃহে যাও, তবে গিরিব্রজগিরির শিখরদেশে উঠিয়া পঞ্চগিরি ব্যূহস্থিত জরাসন্ধের লীলাভূমির ভগ্নাবশেষ দেখিও, সেই পর্ব্বতের কটিদেশে দণ্ডায়মান হইয়া পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনির শতকম্পন শ্রবণ করিও, প্রাণ পুলকিত হইবে।"

- শ্রী রামলাল সিংহের কলমে "রাজগৃহ বা রাজগিরি দর্শন"-এর শেষপর্ব

"আমার ধারণা, পৃথিবীর সব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এই এক উপমহাদেশ নিজের হৃদয়ে ধারণ করে আছে। ভালোবাসা থেকে বিদ্বেষ, চাতুরি থেকে সরলতা– সব!"

- লেখক ও পর্বতারোহী স্টিফেন অল্টারের সঙ্গে ছোট্ট আলাপচারিতায় মুহিত হাসান দিগন্ত

কথোপকথন

সামনে অনেক নিচে পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় ঝলমল করছে লেহ শহর। তাকে সযত্নে দুহাত বাড়িয়ে বাইরের জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে শ্বেতশুভ্র স্তোক কাংড়ি পর্বতমালা - এও কি কম পাওয়া?

- ধারাবাহিক ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব-এর পঞ্চম পত্র দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে

~ আরশিনগর ~

বর্ষায় অরণ্যে - অরিজিত কর

~ সব পেয়েছির দেশ ~

মেঘ ছুঁয়ে কল্পেশ্বরে - সুমন্ত মিশ্র

সপ্তমন্দিরের দেশে - দেবতোষ ভট্টাচার্য্য

ম্যাজিকাল মংলাজোড়ি - পলাশ পাভা

যেখানে রূপকথা মিশে আছে প্রকৃতিতে
- অনিরুদ্ধ ভৌমিক

~ ভুবনডাঙা ~

দিন তিনেকের ভুটান
- সম্পত ঘোষ, সায়ন্তিকা ঘোষ

~ শেষ পাতা ~

কুরুবুরু পাহাড় ও সোনকুপি অরণ্য - সায়ন ভট্টাচার্য

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 18 **AmaderChhuti.com ● Web De**sign: Madhuwanti Basu

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ – তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

।বিভিন্ন সূত্র থেকে শ্রী রামলাল সিংহ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পেয়েছি তা হল - পাটনানিবাসী বি-এল উপাধিধারী শ্রী সিংহ ছিলেন প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক। নব্যভারত পত্রিকার ১৩০২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাদুটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই লেখাটি পড়ে পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী শরীর সারানোর উদ্দেশ্যে মাসখানেক রাজগিরে কাটান ও ফিরে এসে তিনিও পরবর্তীতে পত্রিকায় রাজগির নিয়ে একটি দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখেন। সেই দিক থেকে লেখাটির একটা অন্য গুরুত্বও রয়েছে। সেইসময়ের হিন্দু বাঙালির তীর্থভ্রমণের এই কাহিনিটিতে ধর্ম এবং জাতিবোধের কিছু প্রাবল্য থাকলেও ভ্রমণের বর্ণনা আকর্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাঙালির তীর্থভ্রমণ কাহিনি শাখাটি কিন্তু সম্পূর্ণতই পুরুষ লেখকদের নির্মিত। সেকালের বাঙালি নারীর ভ্রমণকাহিনিতে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্নগোত্রের। তবে যে কোনও লেখাকে তার সমকাল দিয়ে বিচার করাই ভালো।

এই লেখায় উল্লিখিত 'সরস্বতী' নদীটি আসলে 'শর্বতী' নদী। স্থানীয় মানুষদের উচ্চারণ অনুধাবনে লেখক হয়তো ভুল করেছিলেন। ভুলটি নজরে এনে আমাদের ধন্যবাদার্হ করেছেন 'আমাদের ছুটি'-র বন্ধু হিমাদ্রী শেখর দত্ত।।

রাজগৃহ বা রাজগিরি দর্শন

শ্রী রামলাল সিংহ

পূর্ব প্রকাশিতের পর -

গিরি-ব্রজগিরিসঙ্কট - এমন রমণীয় স্থান আর দেখি নাই। দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত মালা, মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। সেই সৌম্য শান্ত অটল অচল মধ্যবর্ত্তী গিরিপথ দিয়া স্বচ্ছসলিলা বাণগঙ্গা লজ্জা-নম্র বধূসম ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে, সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উভয় তট শ্বেত রক্ত হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত মসৃণ প্রস্তরাচ্ছাদিত। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন, এইখানেই "গজদ্বার' ছিল। এক সময়ে এই গিরি-সঙ্কট যে সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম। নিম্নদেশে স্থানে স্থানে প্রবেশ দ্বারের ভগ্নাংশ সুচারু সজ্জিত প্রস্তর রাশি এখনও বর্ত্তমান; উভয় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতোপরি ১৩ ফুট প্রস্থ পাষাণ-প্রাচীর বহুদূরাবধি অজগর সর্পের ন্যায় শায়িত রহিয়াছে। আমরা পশ্চিমদিকের পর্ব্বতে উঠিয়া এই প্রাচীরের উপর দিয়া বহুদূর গেলাম, কিন্তু কোথায় শেষ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইলাম না। এই গিরিসঙ্কটের দক্ষিণেই বিস্তৃত উর্ব্বর ধান্যক্ষেত্র, পূত-সলিলা বাণগঙ্গা, গিরিব্রজ গিরির দক্ষিণ পাদ বিধৌত করিয়া, সেই ক্ষেত্র রাশির মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, পঞ্চানন নদে মিশ্রিত হইয়াছে। পুরাকালে গিরিব্রজপুরের বহির্দ্দেশে, ঐ গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ দিকে, শস্য-শালিনী সমতল ভূমিতে যে সমৃদ্ধশালী গ্রামাদিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহারও চিহ্ন দেখিলাম। সে গ্রাম নাই, সে সৌধমালা নাই, আছে শুধু সেই প্রাসাদাবলির প্রস্তর খণ্ডের স্তূপরাশি! পাঠক, একবার এইখানে আসিয়া ভারতের লুপ্ত-গৌরবের কঙ্কাল রাশি দর্শন কর। এই গিরিসঙ্কট দেখিতেই বেলা দ্বিপ্রহর হইল, জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল, সকলে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। আমাদের বাসা সেখান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ, নিকটস্থ গ্রাম এক ক্রোশের অধিক লক্ষিত হইল, সকলেই চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে জনৈক ব্যাপারী বলদ পৃষ্ঠে ছালা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, সে গিরিসঙ্কট পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল – বাপু হে, তুমি বলদ পৃষ্ঠে কি লইয়া যাইতেছ, আমাদের কিছু আহারীয় সামগ্রী দিতে পার? সে বলিল, আমি মহাজনের চিঁড়ে লইয়া যাইতেছি আমার নিকট আপনাদের আহার-যোগ্য কিছুই নাই। আমাদের অবস্থা জানাইলাম, অনুনয় বিনয় করিলাম, তাহাতে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইল না। ক্রমে দেখিলাম, বলদগুলি অতি সাবধানে মসৃণ প্রস্তরের উপর দিয়া বাণগঙ্গা পার হইল, ব্যাপারীও চলিয়া যায়, তখন অনন্যোপায় দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু ভয় প্রদর্শনার্থ সেই ব্যাপারীকে বলিলেন, তুমি হাকিমদের কথা শুনিতেছ না, তোমার বিপদ সমূহ দেখিতেছি। তখন সে রাজি হইল এবং আমাদের নিকট ১৪ টী গোলকপুরি পয়সা ছিল, তাহা লইয়া দুই অঞ্জলি উৎকৃষ্ট চিঁড়ে এবং কতকগুলি পানিফল দিল। আমরা তাহাকে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই শিলাতটে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম, এবং কতক চিঁড়ে সকলে আপনাপন পকেটে পূরিয়া লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

আমরা যখন গিরিব্রজোপরি উঠিবার পথের নিকট আসিলাম, তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত, কিন্তু গিরিশিখরস্থ মন্দির দর্শনাভিলাষ বড়ই বলবতী, কাজেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম, পথ মন্দ নয়, তবে আমরা অনেক পথ চলিয়াছিলাম বলিয়া একটু একটু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমাদের যে বন্ধুটি পূর্ব্বদিন বিপুলাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি আজি সকলের ধিক্কারে লজ্জিত হইয়া আমাদের সঙ্গে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু তৃতীয়াংশ পথ উঠিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, আমরা কাজেই তাঁহাকে সেইখানে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিলাম। শৃঙ্গস্থ মন্দিরে আসিয়া আমরা সকল ক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম। এইখানে আসিয়াই গিরিব্রজপুরির যে পূর্ণ দৃশ্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। মন্দিরের গঠন বাঙ্গালা দেশের মন্দিরের ন্যায়, মন্দির প্রাঙ্গন চতুর্দ্দিক উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং প্রাচীরের বহির্দ্দেশে প্রশস্ত চত্তাল, প্রাঙ্গনের চতুঃপ্রাচীরে চারিটি অর্দ্ধ-মন্দির বক্রভাবে নির্ম্মিত এবং প্রত্যেকের মধ্যে বুদ্ধদেবের যুগল পাদুকা কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত। প্রধান মন্দির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত শতফণী-উপরি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষীদিগের হস্তে সে সুন্দরমূর্ত্তি স্থানে২ বিকৃতাঙ্গ হইয়াছে। মন্দির বহুদিনের যে পুরাতন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল না। পাঠক, যদি কখন রাজগৃহে যাও, তবে গিরিব্রজগিরির শিখরদেশে উঠিয়া পঞ্চগিরি ব্যূহস্থিত জরাসন্ধের লীলাভূমির ভগ্নাবশেষ দেখিও, সেই পর্ব্বতের কটিদেশে দণ্ডায়মান হইয়া পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনির শতকম্পন শ্রবণ করিও, প্রাণ পুলকিত হইবে।

আমাদের মন্দির দেখিয়া নীচে নামিতে বেলা প্রায় ১টা হইল। ফিরিয়া আসিতে পথে গিরিব্রজগিরির মধ্য-উপত্যকা ভূমিতে, বৈভার, রত্নাচল, রত্নগিরি এবং

বিপুল মধ্যস্থিত বিস্তৃত সমতল ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে চন্দ্রাকার দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বনবৃক্ষাচ্ছাদিত হইয়া আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিলাম। পাণ্ডা বলিলেন, ইহা এক অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, ইহা 'সূর্য্যদ্বার' হইতে 'গজদ্বার' অবধি যে পথ এবং গৈরিক গিরিশৃঙ্গ হইতে জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ অবধি যে পথ ছিল, তাহারই সন্ধিস্থলে স্থিত। যাহাতে কোন শত্রুরাজপ্রাসাদে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথাটা বড় অসম্ভব বোধ হইল না। কিন্তু আমরা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই উপত্যকার স্থানে স্থানে যে সকল প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান দেখিলাম, উহা যদি জরাসন্ধের সময়ের হয়, তবে ত সে আজি সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরের কথা, মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, আর পাষাণময় সৌধমালার চিহ্ন বিলুপ্ত হইল? আর সেই পঞ্চগিরি-বেষ্টিত বিপুল সৈন্যে রক্ষিত উপত্যকা ভূমিতে দ্বিতীয় দুর্গ নির্ম্মাণের আবশ্যক কি ছিল? পাণ্ডা বলিলেন, সে সৌধমালা, সে প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদাদি বিজেতা ও বিধর্ম্মীদিগের হস্তে বিদ্ধস্ত হইয়া, প্রকৃতির সহিত এতকাল যুদ্ধ করিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে; আর আজি যে প্রাচীর মৃত্তিকাময় দেখিতেছেন, তাহা এক সময়ে প্রস্তরাচ্ছাদিত ছিল, এবং উহাদের প্রতি এত মনুষ্য অত্যাচার হয় নাই, তাই সেই সকল স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পার্ব্বতীয় হিংস্র বন্যজন্তু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, রাত্রিকালে বন্য জন্তুর এবং গুপ্তশত্রুকুলের পথ অবরোধ করিবার জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে লিখা আছে। আমাদের কেহ কেহ বলিলেন, বোধহয় উহা বৌদ্ধকালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। যখন মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে স্থাপিত হইল, যখন গিরিপথ সকল বিপুল সৈন্য দ্বারা রক্ষা করা অসম্ভব হইল, তখন বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ উপত্যকা ভূমিতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ তর্ক করিতে করিতে বেলা তিনটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, স্নান আহারাদি করিতে চারিটা বাজিল। সে দিন আর কোথাও যাওয়া হইল না, বাসায় বসিয়া কেহ তাস খেলিতে লাগিলেন, কেহ বা আমাদের পাণ্ডার সহিত শাস্ত্রালাপ লইয়া রহস্য আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় রাজগিরি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক আওরাইয়া আপনার বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছেন। "শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছে বিস্মৃতির জলে, স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা, তেজহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস"। এখানকার পাণ্ডারা বলেন, তাঁহারা কান্যকুব্জ, মহারাষ্ট্রীয়, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী এবং কর্ণাটী ব্রাহ্মণের বংশধর। কিন্তু আজি তাহারা অতি দরিদ্র, চরিত্র বড়ই দূষণীয় এবং নিন্দনীয়। আমাদের পাণ্ডা একটি কদর্য্য পীড়া ভোগ করিতেছেন দেখিতে পাইলাম।

বুধবারঃ–আজি প্রত্যূষে আমাদের মধ্যে তিন জন বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈভারাচল আরোহণ করিতে চলিলাম। সমতল ভূমি হইতে পাকা সিঁড়ি দিয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াই বৈভারের পূর্ব্বপাদে সাতটি কুণ্ড বা উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া গেল। যথা (১) সপ্তঋষি কুণ্ড বা সপ্তধারা কুণ্ড, (২) ব্রহ্মকুণ্ড, (৩) গঙ্গা-যমুনা কুণ্ড, (৪) ব্যাসকুণ্ড, (৫) মার্কণ্ডকুণ্ড, (৬) অনন্তঋষি কুণ্ড, (৭) কাশ্যপঋষি কুণ্ড।

সপ্তঋষিকুণ্ড বা সপ্তধারাঃ–এই কুণ্ডটি দীর্ঘে পঞ্চাশ ষাট হাত এবং প্রস্থে দশ বার হাত হইবে, চতুর্দ্দিক উচ্চ ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত। এই কুণ্ড মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি পাথরের নল দিয়া অনবরত উষ্ণজল পড়িতেছে, পাঁচটি নল পশ্চিম দিকে এবং দুইটি দক্ষিণদিকে। পাণ্ডারা বলেন, এই সাতটি নল সাতটি পৃথক পৃথক প্রস্রবণের মুখ, কিন্তু আমরা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলাম যে প্রস্রবণ একটী এবং উহার জল পয়োনালা দিয়া বহিয়া গিয়া ৭ টি ভিন্ন মুখ দিয়া কুণ্ড মধ্যে পড়িতেছে; পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের নলের নিকটই প্রস্রবণের মুখ, সেই জন্যই ঐ নল হইতে প্রবলতমবেগে অধিকতর জল নির্গত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পয়োনালায় কোনরূপ গোলযোগ হওয়াতে উত্তর-পশ্চিম কোণের নল হইতে জল পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কুণ্ডের জল মকদুমকুণ্ডের জল অপেক্ষা উষ্ণতর, কুণ্ড মধ্যে সদা সর্ব্বদা আন্দাজ আধহাত জল থাকে, অতিরিক্ত জল পয়োনালা দ্বারা বহির্গত হইয়া গিয়া সরস্বতীবক্ষে পড়িতেছে। জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপল খণ্ড কুণ্ডের তলায় বিছান আছে। এই কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, যামদগ্ন্য, দুর্ব্বাসা, পরাশর এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি। এই ঋষিদিগের নামে কুণ্ডের একটি একটি নলের নাম হইয়াছে, এবং সেইজন্যই ইহাকে সপ্তঋষিকুণ্ড বলে। আবার সপ্তধারায় জল পড়িতেছে বলিয়া সচরাচর লোকে সপ্তধারা কুণ্ড বলিয়া থাকে। এই কুণ্ডের জল মকদুমকুণ্ডের ন্যায় পর্ব্বত গাত্র হইতে নির্গত হইতেছে, জল অতি পরিষ্কার এবং ইহার ক্ষুধাকারী শক্তি অত্যন্ত অধিক। উষ্ণজল অল্পক্ষণ মাত্র মাটীর বাসনে রাখিলেই শীতল হইয়া যায় এবং খাইতে সুমিষ্ট।

ব্রহ্মকুণ্ডঃ - সপ্তধারার পার্শ্বেই ব্রহ্মকুণ্ড, ইহার জল অত্যন্ত উষ্ণ। যাত্রীদিগকে প্রথমে সপ্তধারায় স্নান করিয়া, অন্ততঃ কাপড় ভিজাইয়া, এই উষ্ণতর কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই কুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত, কুণ্ডটি সাত আট হস্ত প্রস্থে এবং ঐরূপ দীর্ঘে হইবে, চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই কুণ্ডে মুখ ধুইবার বা কুলকুচা করিয়া ফেলিবার অধিকার নাই। কুণ্ডমধ্যে জল বুদ্বুদ্ অনবরত দেখিতে পাওয়া যায়। সদা সর্ব্বদা কুণ্ড মধ্যে এক গলা জল থাকে, অতিরিক্ত জল ক্ষুদ্র পয়োনালা দিয়া বহিয়া গিয়া সরস্বতী নদীতে পড়িতেছে, কুণ্ডে নামিবার সিঁড়িও আছে।

(৩) গঙ্গা-যমুনা কুণ্ডঃ - দুইটি পাশাপাশি নল দিয়া জল কুণ্ডেতে পড়িতেছে, একটি নল গোমুখী এবং অন্যটি মকরমুখী। পাণ্ডা বলিলেন, একটি ধারার জল শীতল এবং অন্যটির জল উষ্ণ বলিয়া গঙ্গা-যমুনা নাম হইয়াছে, আমরা নীচে নামিয়া ইহার পরীক্ষা করিলাম না, এই কুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত পঙ্কিল বলিয়া বোধ হইল। ব্যাসকুণ্ড প্রভৃতি অন্য চারিটী কুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত; কুণ্ডগুলি ছোট ছোট, ইহাদের জল বড় ব্যবহৃত হয় না। কেহ কেহ দেখিলাম শৌচক্রিয়ার্থ ঐ জল ব্যবহার করিতেছেন।

উপরে যে সকল কুণ্ডের কথা বলিলাম, তাহা পর্ব্বত সানুদেশ হইতে দশ পনর হাত নিম্নে, কুণ্ডে স্নান করিতে হইলে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যাইতে হয়। উপরস্থ সমতল ভূমিতে দুইটি শিবমমন্দির দেখিলাম, একটি সপ্তধারা কুণ্ডের উত্তরদিকে এবং অন্যটি পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, পূর্ব্বদিকে একটি অসম্পূর্ণ মন্দির, ইহা গয়ার জনৈক হিন্দু তৈয়ার করাইতে ছিলেন, তাঁহার সহসা মৃত্যু হওয়াতে বিগ্রহ স্থাপিত হয় নাই। ব্যাসকুণ্ডের নিকট আমরা কামাখ্যা গুহা নামক একটি ক্ষুদ্রগুহা, এবং দণ্ডশ্রেয় মুনির সমাধি দেখিলাম। হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের অত্যাচারের নিদর্শন সুদূর মগধের এই গিরি-প্রস্রবণের নিকটে বৈভারাঙ্কে আজিও অঙ্কিত দেখিলাম। পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ মন্দিরের পুর্ব্বদিকে ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত মুসলমানদিগের নিমাজ পড়িবার স্থান। শুনিলাম মুসলমানেরা বৎসরান্তে বকরিদের সময় আসিয়া ঐখানে নিমাজ পড়িয়া থাকেন, অন্য সময়ে উহা বন্ধ থাকে।

বৈভারের পূর্ব্বপাদে এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি হিন্দু এবং জৈনদের পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি তিন বৎসরে হিন্দি মলমাসে এখানে বৃহতী হিন্দুমেলা হইয়া থাকে, বহুসংখ্যক হিন্দু নরনারী স্নানার্থ সমবেত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ড মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মিত হয়। জৈনেরা মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস অবধি এই সকল কুণ্ডে এবং সরস্বতী ও বাণগঙ্গা নদীতে স্নান, পঞ্চ-পর্ব্বতস্থিত মন্দির সকল দর্শন এবং বুদ্ধ 'পাদুকার' পূজা করিয়া থাকে। রাজগৃহ জৈনদিগের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, বৃদ্ধ যুবা সকল শ্রেণীরই লোক দেখিলাম রাজগৃহে আসিয়া থাকেন। যাঁহারা সবলকায় কিম্বা যাঁহাদের সঙ্গতি অতি অল্প, তাঁহারা পদব্রজেই রাজগৃহ –দর্শন এবং পর্ব্বতারোহণ করিয়া থাকেন, কেহ নগ্ন পদে কেহবা কাপড়ের জুতা পায় দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা অক্ষম বা সঙ্গতি-সম্পন্ন, তাঁহারা ছোট ছোট ডুলিতে দুইজন, কখনও চারিজন বেহারা, উহাদিগের মায় ডুলি ভাড়া ২৷৷৵১০ দিলে তোমাকে পাঁচটি পাহাড়ের উপরে যতগুলি জৈনমন্দির আছে, সকলগুলি দেখাইয়া দিবে। ইহারা জাতিতে 'কাহার' – কৃষ্ণকায়, পার্ব্বত্য প্রদেশে থাকে বলিয়া যে বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট তাহা নয়, তবে বড়ই কষ্টসহিষ্ণু এবং পর্ব্বতারোহণে বড় দক্ষ। ইহারা পিঠে করিয়া বালক বালিকা কিম্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাও দেখিলাম। হিন্দুরা পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ মন্দির দেখিতে যান না। স্রোতস্বতী সরস্বতী হিন্দু ও জৈন উভয়ের নিকট সমান সমাদৃতা। পাণ্ডা বলিলেন, "কর্ম্মভ্রষ্টা যে লোকা, পতিতবেদ বিসর্জ্জিতা, শ্রুতি স্মৃতি বহির্ভূতা অস্তে যাং শুদ্ধে সরস্বতী" কিন্তু আমাদের ন্যায় নবোত্থিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় ঐ সূত্রের অন্তর্গত হইতে পারেন না জানিয়া আমরা সরস্বতী নদীতে স্নান করি নাই। ইহাতে আমাদের পাণ্ডা বিশেষ কিছু যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এমনও বোধ হইল না।

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড সকলের উপরে বিহারের জনৈক প্রসিদ্ধ জমিদারের অতিথিশালা, কিন্তু এখানে থাকিবার একটি অসুবিধা এই যে কোন ঘরের দরজা নাই। এখান হইতে ৬০ কিম্বা ৭০ ফিট উপরে উঠিয়াই একটি বৃহৎ পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। ইহার চারিটি গবাক্ষ। ইহা এক সময়ে প্রবেশ দ্বার এবং পর্ব্বতস্থ প্রাচীর রক্ষার্থ প্রহরীদিগের থাকিবার স্থান ছিল বলিয়া বোধ হইল। এই প্রকোষ্ঠের উপরিভাগ প্রস্তরাচ্ছাদিত, ছাদের উপরে একটি মুসলমানি কবর দেখিলাম। ঐ প্রকোষ্ঠের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে সোমেশ্বরনাথ মহাদেবের হিন্দুমন্দিরে যাইবার পথ। মন্দির এক্ষণে ভগ্ন অবস্থায়।

বৈভার পর্ব্বতোপরি আমরা পাঁচটি জৈন মন্দির দেখিলাম। প্রথমটি প্রায় চারিশত ফিট উচ্চে হইবে, মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত; মন্দির মধ্যে 'বুদ্ধ পাদুকা' অর্থাৎ এক প্রস্তর খণ্ডে ক্ষুদ্র চরণদ্বয় খোদিত। একপার্শ্বে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত দুইটি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া কাছাকাছি আরও তিনটি জৈন মন্দির দেখিলাম, উহার মধ্যে প্রথম মন্দিরটিতে একটি প্রস্তরখণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত। প্রবেশ দ্বারেও ওইরূপ মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। মন্দিরে উঠিবার সিঁড়িগুলি কোন ভগ্নগৃহ বা মন্দিরের ক্ষুদ্র পাথরের থাম দিয়া তৈয়ারি। দ্বিতীয় মন্দিরটি চতুষ্কোণ, মন্দির বেষ্টনের জন্য চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত পথ, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ভিতর দিকে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। একদিকে 'নেমজিকা পাদুকা' নামক বুদ্ধ পদচিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত। মুরসিদাবাদের জৈনেরা সম্প্রতি, ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। তৃতীয়টি কতকটা পিরামিডাকৃতি। ইহাকে প্রাণ বিবির মন্দির বলে। মন্দিরের দেয়াল প্রায় পাঁচফিট প্রস্থ, প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পাথরের থামওয়ালা বারাণ্ডা। এখান হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চে আসিয়া বৈভারের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গস্থ জৈন মন্দির দেখিলাম। মন্দির মধ্যে আবার সেই বুদ্ধ পদচিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত, দেখিলাম একজন জৈন-যাত্রী চাল এবং একটি বাদাম দিয়া চরণদ্বয়ের পূজা করিলেন। এই মন্দিরের নিকটে আসিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। মন্দিরের ১৫।২০ হাত দক্ষিণেই পাহাড় একেবারে নামিয়া গিয়াছে। এইখান হইতে ঠিক নিম্নদেশে রাজগৃহ উপত্যকার

পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, জরাসন্ধের সেই মল্লভূমি, সেই উপত্যকা মধ্যস্থিত তড়াগ, সেই নির্ম্মল কূপ, সেই মৃত্তিকা প্রাচীর বেষ্টিত উপত্যকা খণ্ড সবই সুন্দর দেখা যিতেছে। উপত্যকার মধ্যভাগে মেখলার ন্যায় শোভমানা ক্ষীণা সরস্বতী যুগ-যুগান্তের অতীত কথা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহমানা। অগণন গো মহিষাদি পিপিলিকা শ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের গলদেশস্থিত ঘন্টার মধুর নিক্কণ শুনা যাইতেছে। কোথাও বা রাখাল বালকেরা খেলা করিতেছে, কোথাও বা কাঠুরিয়ারা গান গাহিতে গাহিতে দলে দলে কাঠ কাটিতে যাইতেছে। এই স্থানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা নীচে নামিতে লাগিলাম। উপরোক্ত পিরামিডাকৃতি মন্দিরের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া, উত্তর দিকে নামিয়া গিয়া, বৈভারের উত্তরাঙ্কস্থিত দুইটি গুহা দেখিতে চলিলাম। পথ সঙ্কীর্ণ ও কন্টকাকীর্ণ, এক স্থানে একদিকে বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন, অন্য দিকে পাহাড় সিধে নামিয়া গিয়াছে, একটু পদস্খলিত হইলেই সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইতে হইবে। যাত্রীরা এখানে আসেন না, সাহেবরা কখনও কখনও এই গুহা দেখিতে আসিয়া থাকেন। আমাদের পাণ্ডা এ গুহা দ্বয়ের পথ জানিতেন না। আমরা আর এক দল পাণ্ডার (যাঁহারা সর্ চার্লসকে এই গুহা দেখাইয়াছিলেন) সাহায্যে সেই দুর্গম পথ দিয়া বৈভারের কটিদেশে উত্তরদিকে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ সুন্দর গুহায় উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিকের গুহাটির ভিতরে খানিকটা গিয়া দেখিলাম, বক্রভাবে বামদিকে বহুদূরাবধি গুহা চলিয়া গিয়াছে, পাণ্ডারা বলিলেন, উপরে (পিরামিডের ন্যায়) মন্দিরের নিম্নদেশে যে গহবর দেখিয়াছেন, তাহাই এই গুহার অন্যমুখ। কিন্তু গুহা অন্ধকার, অপরিষ্কার পূতিগন্ধময় বলিয়া বেশী ভিতরে যাইতে সাহস হইল না। পার্শ্বস্থ গুহাটিও খুব বড়, কিন্তু উহা তত দীর্ঘ নয়। অনেকগুলি শজারুর কাঁটা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া কুড়াইতে লাগিলাম, এমন সময়ে এক স্থানে দেখিলাম, টাটকা রক্ত চিহ্ন - বৃহৎ বৃহৎ হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের রাজগিরে পঁহুছিবার পূর্ব্বদিনে গুলি দ্বারা আহত একটি ব্যাঘ্র ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল শুনিয়াছিলাম, তাই আমাদের মধ্যে দু একজন অত্যন্ত ভীত হইলেন, কাজেই আমরা তৎক্ষণাৎ সেই খান হইতে প্রস্থান করিলাম। বৈভারাচলে নীলবর্ণের একপ্রকার সুন্দর বনফুল দেখিলাম, সৌরভে মন মোহিত হইল। আমরা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কৈ সাধু সন্ন্যাসী কৈ? তিনি বলিলেন, যদি ধ্যানস্থ সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে চান, তবে তপোবনে যান। তপোবন রাজগৃহের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। সেখানে আজিও সন্ন্যাসীগণ তপস্যানিরত আছেন দেখিতে পাইবেন। সেখানেও এইরূপ পাঁচটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহা হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থান। আমাদের সময়াভাবে তপোবন দেখা হইল না। আমরা বৈভারের উত্তর গাত্রে প্রস্তর প্রাচীরের ভগ্নস্তম্ভের সারি উচ্চতম শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে দেখিলাম, মনুষ্য-হস্ত-পরিষ্কৃত অধিত্যকা ভূমিতে বহুসংখ্যক গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিলাম।

আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় এগারটা হইল। বাসায় আসিয়া দেখি, আমাদের তিনজন বন্ধু আহারাদি করিয়া বিহারে চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের জিনিষপত্র একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টর বাঙ্গালার বাহির করিয়া মাঠে ফেলিয়া দিয়াছেন, আমাদের চাকর- ব্রাহ্মণদের তাড়াহুড়া দিতেছেন, শীঘ্র রান্নাঘর খালি করিয়া দাও। শুনিলাম, বেহারের সবডিভিজনাল ডিপুটীবাবু টুরে আসিতেছেন, সঙ্গে আত্মীয় স্বজনও রাজগির দেখিতে আসিতেছেন। একটা বৃহৎ তাঁবু পড়িয়াছে, কেহ মাছ আনিতেছে, কেহ দুগ্ধ দধি আনিতেছে, কেহ বেগার ধরা পড়িয়া জল আনিতেছে, স্তূপাকার কাষ্ঠও সঞ্চিত হইয়াছে, মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহারাদি করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি, আমরা বেহারে আসিয়া শুনিলাম, ডিপুটিবাবুর ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। তিনি যাহাতে আমাদের কষ্ট না হয়, সেই জন্য নিজের থাকিবার নিমিত্ত তাঁবু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমরা পাণ্ডাকে একটাকা বিদায় দিয়া, রাজগৃহ গ্রামের মধ্য হইয়া পূর্ব্বদিকে বিপুলাচলের পার্শ্বদেশ দিয়া 'গিরিয়াক্' গিরি দর্শনার্থে যাত্রা করিলাম। রাজগৃহ গ্রামের দুই তিন মাইল পূর্ব্বে বিপুলাচলের একাংশের নাম সোণা পাহাড়, সোণা পাহাড়ের তলদেশে কল্যাণপুর গ্রাম। ভূতপূর্ব্ব কল্যাণপুর গোল্ড মাইনিং কোম্পানির বাঙ্গলা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। রাজগৃহ গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে আসিয়া কিছুদূর দক্ষিণদিকে গিয়াই গিরিয়াক্ গিরির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রত্নকূট এবং বিপুলাচল সম্মিলিত হইয়া যে শৃঙ্গমালা উঠিয়াছে, তাহারই নাম গিরিয়াক গিরি। এই পর্ব্বতের অধিকাংশ প্রস্তর গৈরিক বর্ণের, বোধহয় সেই জন্য ইহাকে গৈরিক গিরি বলিত এবং গিরিয়াক্ গৈরিক্ গিরির অপভ্রংশ মাত্র। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গোপরি ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বৃহৎ স্তম্ভ, উহার পরিধি ৬৮ ফিট এবং উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফিট। ইহা জরাসন্ধের বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রস্থ প্রাকৃতিক শোভা বড়ই মনোরম, পশ্চাতে গৈরিক গিরির অভ্রভেদী শিখরমালা, সম্মুখে বিপুল বৈভার প্রভৃতি পঞ্চগিরির নির্ঝরিণী বারি বক্ষে ধারণ করিয়া পঞ্চানন নদ গিরিয়াক্ গিরির পূর্ব্বপাদদেশ বিধৌত করিয়া দক্ষিণদিকে বহিয়া চলিয়াছে। ভীম অর্জ্জুন এবং পার্থ সখা শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চানন নদ পার হইয়া, গৈরিকগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, গুপ্তবেশে জরাসন্ধের রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী এই পঞ্চানন নদে স্নান করিয়া, আপনাদের জীবন পবিত্র করিয়া থাকেন। পঞ্চানন নদ এখন পঞ্চনেহ বা পঞ্চানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার অপর পারে গিরিয়াক্ গ্রাম। গিরিয়াক্ গ্রামের সমুখস্থ পর্ব্বতাংশের নিকটে আসিয়া গৈরিক গিরি শৃঙ্গস্থ স্তম্ভ দেখিতে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলাম। এখানে মেলার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যাত্রীরা বড় আসেন না বলিয়া পাণ্ডারা এখানে থাকেন না, রাজগিরির পাণ্ডারাই যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে পাণ্ডা না থাকাতে আমরা উপরে উঠিবার পথ খুঁজিয়া পাইলাম না, আন্দাজি একটী পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, তৃতীয়াংশ পথ উঠিতেই তিনটা বাজিয়া গেল, অবেলায় আর উপরে উঠা যুক্তিসঙ্গত নয় বুঝিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু স্থানে স্থানে দেখিলাম, পুরাকালে যে সকল উঠিবার পথ ছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভশালী শিখরের কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে সমতল ভূমি হইতে ৬০ কিম্বা ৭০ ফিট উচ্চে একটি বৃহৎ গুহা দেখিলাম। গুহার বহির্দ্দেশে মধুচক্রাকৃতি প্রায় ২০ ফিট দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড শৈলগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। নীচে কোন রূপ সাহায্য নাই, মনে হয় উহার তলায় গেলে মাথায় পড়িবে। কিন্তু কতকাল হইতে যে উহা ঐরূপ শূন্যে রহিয়াছে, কে বলিতে পারে? গুহাটি বিলক্ষণ প্রশস্ত, মধ্যভাগের উচ্চতা ১২ ফিটের কম নয়। ইহার দুইটি প্রবেশপথ দেখিলাম, একটি পূর্ব্বদিকে, অন্যটি পূর্ব্ব উত্তর কোণে। কিন্তু শেষোক্তটি অতি ছোট। এই গুহা দেখিতে যাইবার পথ একটু কষ্টকর, আমরা জুতা খুলিয়া ধরাধরি করিয়া কোন ক্রমে উপরে উঠিয়াছিলাম। যাত্রীরা এই গুহাতে আসিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন, বোধ হইল। গুহার প্রবেশ পথে সিন্দূরের ফোঁটা এবং গুহার ভিতরে ছোট ছোট গোল গোল আলতা মধ্যভাগের পাথরে আঁটা রহিয়াছে দেখিলাম। অতঃপর অপরাহ্ন হইয়া আসিল দেখিয়া আমরা পঞ্চানন নদ পার হইয়া গিরিয়াক্ গ্রামাভিমুখে চলিলাম। পঞ্চানন নদেতে জল এক হাঁটুর কিছু বেশি। কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে হইলে আমাদের ধূতি পরা দেশিবেশই সুবিধাজনক দেখিয়া আজ প্রায় সকলেই ধূতি পরিয়া, এক জন কেবল মাত্র পেন্টুলান পরা, কাজেই তাঁহার নদ পার হইতে অসুবিধা হইল। এক্কাগুলিও অনায়াসে পার হইয়া গেল। আমাদের গিরিয়াক্ গ্রামের নিকট একজন মুসলমানের সহিত দেখা হইল। সে বলিল, আমরা যে দিক দিয়া গৈরিক গিরিশৃঙ্গোপরি উঠিতেছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই উপরে উঠিবার আসল পথ। পথটি গিরিয়াক্ গিরির উচ্চতম শৃঙ্গস্থ স্তম্ভ অবধি গিয়াছে, দেখিলাম। মধ্য পথে ঋষি আসন মাইর মন্দির। গিরিয়াক্ গ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণে গিরিব্রজগিরি এবং গৈরিকগিরি মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে রাজগৃহে প্রবেশের যে পূর্ব্বদ্বার ছিল, শুনিলাম তাহার ভগ্ন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। যদিও ডাকবাঙ্গালা ও ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালা নিকটেই ছিল, তত্রাচ সময়াভাবে আমরা সেখানে না থাকিয়া গিরিয়াক্ গ্রামের মধ্য দিয়া বেহারাভিমুখে ফিরিলাম। বেহারে আসিবার পথ পাকা ও প্রশস্ত, এবং দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজি। গিরিয়াক্ গ্রাম পাটনা জিলার সীমান্তে অবস্থিত, বেহার ঐখান হইতে ১১ মাইল। আমরা পথে আসিতে আসিতে জৈনদিগের প্রধান তীর্থ স্থান পাণ্ডপুরী দেখিতে পাইলাম। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর মন্দিরাদি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেলা পাঁচটার সময় বেহারে পঁহছিলাম। সেই বেলিসরায়ে আবার রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে মেলকার্ট করিয়া বখতিয়ারপুরে আসিয়া, এবং সেখানে এক আত্মীয়ের বাটীতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

বাল্যকালে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম যে, "যে প্রদেশে আগ্নেয়গিরি আছে, অথবা পূর্ব্বে কোনকালে ছিল, কিম্বা যেখানে অগ্নিঘটিত অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উৎপাতের ঘটনা হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশেই অনেক উষ্ণপ্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।" কিন্তু আমরা রাজগৃহে আগ্নেয়গিরি কিম্বা অগ্নিঘটিত অন্য কোন নৈসর্গিক উৎপাতের নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না।

পাঠক! রাজগৃহে ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা সেই শৈল উপত্যকার, সেই শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সেই শৈলমালার অধিত্যকা ও উপত্যকা ভূমিতে যে সকল প্রাসাদ এবং দুর্গাদির ভগ্নচিহ্ন দেখিলাম, পর্ব্বতোপরি সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর ও প্রাচীর-স্তম্ভের যে ভগ্নাবশেষ দেখিলাম, সুরক্ষিত প্রবেশদ্বারের যে নিদর্শন দেখিলাম, তাহাতে প্রতীতি জন্মিল যে, রাজগৃহ এক সময়ে প্রবলপরাক্রান্ত বহু অনীকিনীশালী নৃপতির রাজধানী ছিল। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার, সে নৃপতি কে, এবং তাঁহার আবির্ভাবকালই বা কবে? যদি মহাভারতের আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া মান, তবে সেই নৃপতির নাম জরাসন্ধ, এবং তিনি যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক। সে আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের কথা। মহাভারতে দেখিতে পাই, যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাগত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যিনি সকলের প্রভু ও অখণ্ডভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি, তিনিই কেবল রাজসূয় যজ্ঞে অধিকারী হইতে পারেন। যতদিন জরাসন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রাজসূয় যজ্ঞ করা কঠিন। জরাসন্ধ যাবতীয় নরপতিকে পরাজয় করিয়া একাধিপত্য করিতেছে। অপরিমিত বলশালী যবনাধিপতি ভগদত্ত তাহার প্রিয়ানুষ্ঠানে ব্যাপৃত, পুরজিৎ তাহার অনুগত, বঙ্গ, পুন্ড্র ও কিরাত দেশাধিপতি পৌণ্ড্রক তাহার শরণাপন্ন, পৃথিবীর চতুর্থাংশের অধিপতি ভীষ্মকও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া তাহার অনুগত। দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ও পূর্ব্বকোশল নিবাসী রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য নৃপতিমণ্ডলী স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কুন্তিদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও জরাসন্ধের ভয়ে মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিয়া রৈবতক শৈলে পরিশোভিত কুশস্থলী নাম্নী পুরীতে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। শিশুপাল সেনাপতি, অমরতেজা অস্ত্রের অবধ্য হংস ও ডিম্বক ভ্রাতৃদ্বয় জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক। সেই দুই ভ্রাতা ও জরাসন্ধ মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে কেহ তাহাদের সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিতে সক্ষম নয়। তিন অক্ষৌহিণী সেনা তাহার বশবর্ত্তী। সমস্ত দেব দানব একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও সম্মুখসমরে জরাসন্ধকে পরাজয় করা অসম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গোপন ভাবে জরাসন্ধগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া ষড়-অশীতি নৃপতিদিগকে উদ্ধার করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা

বিধেয়। শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্যে নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া ভীম অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই কার্য্যের ভার অর্পিত করিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভ্রাতৃদ্বয় মিলিত হইলেন, - জ্ঞানবল, বাহুবল এবং নীতিবলের সংযোগ হইল। অনন্তর কুরুদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ কুরুজাঙ্গাল, পদ্মসরোবর, কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ ও সদানীরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সরযূসরিৎ পার হইয়া পূর্ব্বকোশল দেশ অতিক্রম করিয়া, মালা, পরে চর্ম্মন্বতী নদী পারে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণনদ পার হইয়া বীরত্রয় কিয়দ্দূর পূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক মগধরাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল সমাকীর্ণ, গোধনপূর্ণ ও মনোহর বৃক্ষরাজি বিরাজিত গোরখ নামক পর্ব্বতের অধিত্যকা দেশস্থ মগধরাজার নগরী সন্দর্শন করিলেন। তদনন্তর চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ করিয়া রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীম জরাসন্ধের সহিত ত্রয়োদশ দিবস বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। "জরাসন্ধের অদ্ভুত কৌশল, - কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ-নিবারণ বিনাযুদ্ধে কৌশলে হইল সাধিত।" পাঠক! তুমি ইহা কবি-কল্পনা বলিতে পার। তুমি বলিতে পার, মহাভারতের রচনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহুকাল পরে হয় নাই কে বলিল, জরাসন্ধ যে আধুনিক কোন নৃপতি নন, তাহারই বা প্রমাণ কি? মহাভারতের গিরিব্রজপুরীর পুর্ব্বোক্ত ভৌগলিক বিবরণের সহিত আধুনিক রাজগৃহ উপত্যকার কি সমতা হইতেছে না, মহাভারতের গিরিব্রজপুরী কল্পিত স্থান নহে, আধুনিক রাজগৃহই যে সেই পঞ্চগিরিমধ্যস্থিত গিরিব্রজপুর, তাহা কি আর বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে হইবে? তবে জরাসন্ধ যুধিষ্ঠিরের বহু পরবর্ত্তী কোন 'ঐতিহাসিক পুরুষ' কি না? হন্টার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ঐতিহাসদিগের মতে সে অনুমান ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাভারত রচিত হয়, তাহা হইলে দেখাইতে পার, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন 'ঐতিহাসিক পুরুষ' কোন মগদেশাধিপতি অখণ্ডসাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ঐ পঞ্চগিরিব্যূহ মাঝে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন? যদি বল জরাসন্ধ কল্পিত পুরুষ, যে ভগ্নরাশি দেখিলে তাহা বৌদ্ধকালে নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরাদির অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বৌদ্ধনৃপতিগণ যে সময়ে মগধদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত, তখন তাঁহাদের রাজধানী ঐ পঞ্চগিরিমধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমিতে নয়, বিম্বিসারের রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০৭ হইতে ৪৮৫ অব্দ মধ্যে, যে দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহা বৈভারের উত্তরদেশে সমতল ভূমিতে, হাউনস্যাং মগধ পরিদর্শনকালে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে যাহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহা আজও বর্ত্তমান; চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে। আর মহাভারতে বলে জরাসন্ধ বিনাযুদ্ধে কৌশলে বিনষ্ট হন, তোমার ইতিহাসও বলেনা যে এই পঞ্চগিরিস্থ পর্ব্বতপ্রাচীরমালা, রাজপ্রাসাদাবলী কোন ঘোরযুদ্ধকালে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাই পুরাবৃত্ততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি, সেই সুদৃঢ় প্রাচীরমালা, প্রবেশ দ্বারাদি কত কালে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া অযত্নে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে? আমরা এই ভারতেই বুদ্ধগয়া এবং বারাণসীর নিকটে সারনাথে দেখিয়াছি, দুই সহস্রবর্ষাধিক ইষ্টক নির্ম্মিত বৌদ্ধমন্দির শত্রহস্তে বিদ্ধস্ত হইয়াও দণ্ডায়মান আছে, ইহা হইতেও অনুমান করা যায়, কতকাল রাজগৃহের সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর এবং দ্বারদেশগুলি এই ভগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বলি, মহাভারতের জরাসন্ধ কল্পিত পুরুষ নহে। পঞ্চগিরিমধ্যস্থিত গিরিব্রজপুর কল্পিত স্থান নহে। তবে নিয়তির গতি অপ্রতিহত। সেই পঞ্চগিরি এখনও উন্নত, সেই সরস্বতী এখনও ধাবিত, সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মগধভূমি এখনও বিস্তৃত, নাই শুধু সেই পূর্ব্বগৌরব। জরাসন্ধের যে সুন্দরীপুরী একদিন নাট্যশালাসম উজ্জ্বলিত ছিল, আজি তাহা নিয়তির বলে মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, বন্য হিংস্র জন্তুর চর-ভূমি হইয়াছে। আজি রাজগৃহের বীর্য্যসাক্ষী উষ্ণ প্রস্রবণ ভারতের শোক-প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে, আজি মগধের বিপুল ও বৈভার নেত্রদ্বয়ে তপ্তশোক-অশ্রুধারা অনর্গল বহিতেছে।

পাঠক! যদি মহাভারতে অবিশ্বাস হয়, যদি ঐ ভগ্নরাশি বৌদ্ধকালে নির্ম্মিত প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ বল, তবে সেও তো অল্প দিনের কথা নয়। দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরাদির ভগ্নাংশ দেখিতে কি বাসনা হয় না? উত্তরভারতে বহু হিন্দুতীর্থ স্থান দেখিয়াছি, রামের জন্মস্থান অযোধ্যা নগরী দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়াছি, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশী, হরিদ্বার দেখিয়াছি, কিন্তু রাজগৃহে আসিয়া যে সুখলাভ করিলাম, তাহা কুত্রাপি হয় নাই। সেই ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রতীতি জন্মিল যে, যে সময়ে ঐ দুর্গ প্রাচীরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন মগধদেশ আর্য্যসভ্যতার আলোক আলোকিত, তখন ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও স্থপতি বিদ্যার উন্নতিকাল। মনে হইল, প্রবাদ যে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রপুরী নির্ম্মাণান্তর ব্রহ্মার আদেশানুসারে জরাসন্ধের পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহা বড় মিথ্যা নয়। পাঠক! যদি পার্ব্বত্যসৌন্দর্য্য দেখিবার বাসনা থাকে, যদি মহাভারতের গাথা কবিকল্পনা নহে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহ, যদি উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করিয়া তাপিত হৃদয় শান্ত করিতে চাহ, তবে একবার রাজগৃহে আসিও। যদি বনফুলের আঘ্রাণে, বনবিহগের মধুর কূজনে, পর্ব্বত কন্দরের প্রতিধ্বনি-কম্পনে প্রাণ পুলকিত করিতে চাহ, যদি অধিত্যকা উপত্যকাভূমি গিরিগুহা একস্থানে দেখিতে চাহ, তাহা হইলে একবার এই ঐতিহাসিক পুরীতে আসিও। একবার রাজগৃহে আসিয়া ভারতের লুপ্তগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন শৈলমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত দেখিও। যদি তুমি ভক্ত হিন্দু হও, তাহা হইলে রাজগৃহ পবিত্রতীর্থস্থান; যদি অসুস্থ হও, তবে তোমার দার্জ্জিলিঙ্গ মধুপুর, বৈদ্যনাথ যাইবার আবশ্যক নাই, শীতকালে রাজগৃহে আসিয়া সপ্তধারায় স্নান কর, তাহার জল পান কর, সকল তাপ দূর হইবে; আর যদি তুমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ হও, তবে এই শৈলমালায়, ঐ উপত্যকাভূমিতে অনেক প্রত্নতত্ত্ব কথা জানিতে পারিবে। আর যদি ঘোর বিষয়ী হও, তাহা হইলে বলিব যে রাজগৃহ ডেয়ারি ফারমিংয়ের প্রশস্ত স্থান, ওয়াটার মিল স্থাপনের উপযুক্ত ভূমি।

(- সমাপ্ত -)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

tell a Friend

-->

কথোপকথন

স্টিফেন অল্টারের সঙ্গে মিনিটপাঁচেক

[মার্কিন বংশোদ্ভূত লেখক ও পর্বতারোহী স্টিফেন অল্টারের জন্ম দেশভাগের পর, ১৯৫৬ সালে, ভারতের উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে। বাবা রেভারেন্ড বব অল্টার ছিলেন ল্যান্ডোরের উডস্টক স্কুলের প্রধানশিক্ষক। সেইসূত্রে তাঁর ছেলেবেলার বেশিরভাগ সময় ওই ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা হিলস্টেশনেই কেটেছে। প্রয়াত অভিনেতা টম অল্টার তাঁর তুতো-ভাইবোনদের অন্যতম। মূলত ভ্রমণকাহিনি ও উপন্যাস লিখে থাকেন স্টিফেন অল্টার। 'All the Way to Heaven: An American Boyhood in the Himalayas' তাঁর স্মৃতিকথা। লিখেছেন ভারতীয় হাতির ইতিবৃত্ত, গঙ্গা ও ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণ নিয়েও। তাঁর শেষতম ননফিকশন গ্রন্থ, হিমালয়ে ভ্রমণের অনন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'Becoming a Mountain' ইতিমধ্যেই বেশ আলোচিত। তাঁর উপন্যাসেও ভারতের বিচিত্র রূপ-রঙ ফুটে উঠেছে সাবলীলভাবে। সম্প্রতি জিম করবেটকে নিয়ে লিখেছেন একটি দীর্ঘ উপন্যাস, 'In the Jungles of the Night'। ছোটদের জন্যও লিখেছেন। দেশ-বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখালেখি বিষয়ে পড়িয়েছেন ও বক্তৃতা দিয়েছেন। বর্তমানে স্ত্রী অমিতাকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন মুসৌরিতে।]

এ মাসে ঢাকা লিট ফেস্টে তিনি আসবেন, সে খবর আগেই জানা ছিল আয়োজকদের আগাম অনুষ্ঠানসূচি সরবরাহের কারণে। দ্বিতীয় দিন সকালে 'আউট অফ দ্য জাঙ্গল' নামের একটি সেশনে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা। সেদিন খুব সকালেই, মূল ফটক খোলার সময় লিট ফেস্টে হাজির হলাম। ছুটির দিনের সকাল, ইতস্তত আকারে আগতদের ঘোরাফেরা দেখছি। দেখলাম, লেখক উইলিয়াম ডালরিম্পল হঠাৎ এলেন। তাঁকে ঘিরে আগে থেকেই ভিড়। নজরে পড়ায় আরো অনেকে ছুটছেন তাঁর দিকে। এমন সময় দেখলাম পাকানো গোঁফধারী এক প্রবীণ একা একা আসছেন ফেস্টের বুকশপের দিকে। কাছে গিয়ে বুঝলাম, ইনিই স্টিফেন অল্টার। ঋজু দেহ, ধারালো চেহারা। একটু ভয়ই হচ্ছিল প্রথম প্রথম। একে তো এমন ডাকবুকো মেজাজের মানুষ, তায় আমি ওঁর একটি মাত্র বই ছাড়া আর কিছু পড়িনি। আর সম্বল ইন্টারনেটে পাওয়া কিছু তথ্য। তাও সাহস করে সামনে গিয়ে আলাপ শুরু করলাম।

♦ স্যার, শুভ সকাল! আপনার 'বিকামিং আ মাউন্টেন' বইটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল, সে কথা আপনাকে জানাতে ইচ্ছা হলে দেখে গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম...

. বইটি পড়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। ঢাকাতে এই প্রথম কেউ আমার ওই বইটির কথা বললে, এখানকার বুকশপেও (লিট ফেস্টের অফিশিয়াল বুকশপ) দেখছি বইটি নেই। অবশ্য আমার নতুন উপন্যাসটি আছে (জিম করবেটকে নিয়ে লেখা তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'ইন দ্য জাঙ্গল অফ দ্য নাইট')।

♦ আপনার আরেকটি বইয়ের কথা শুনেছিলাম, ভারতীয় হাতি বিষয়ে, সেটাও আর পেলাম না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওটা খুব দরদ দিয়ে লিখেছিলাম!

♦ স্যার, আপনি তো চাইলে ভারত ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য যেকোনো দেশে থাকতে পারতেন, কিন্তু এই উপমহাদেশকেই আপনি বেছে নিলেন কেন? তা কি আপনার জন্মস্থান বলেই?

এই উপমহাদেশ আমাকে ভ্রমণে বেরোতে, পৃথিবীর বহু বিচিত্র রূপ দেখতে আকৃষ্ট করেছে। ভারত, পাকিস্তান কি বাংলাদেশে মানবজীবনের নানা মাত্রা আমি দেখতে পাই। বাংলাদেশে যদিও আমি আগে কখনও আসিনি, তবে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও আমি এখানকার মানুষদের একটু বুঝে নিতে চাইবো।... আচ্ছা, এই এলাকার বৈশিষ্ট্যটা কী? ঢাকার অন্যত্র বেশ দূষণ, কিন্তু এখানে খুব তরতাজা বোধ করছি (লিট ফেস্ট যেখানে হচ্ছিল, সেই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের কথা বলছিলেন)!

♦ এটা আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে পড়েছে, এখানকার নিসর্গের সুখ্যাতি আছে। আর কাছেই ইংরেজদের গড়া একটি উদ্যানও রয়েছে, রমনা। ...আচ্ছা, ভ্রমণ ও পর্বতারোহণের মাধ্যমে মানুষ চেনা নিয়ে বলছিলেন...

ঠিক তাই! আমার ধারণা, পৃথিবীর সব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এই এক উপমহাদেশ নিজের হৃদয়ে ধারণ করে আছে। ভালোবাসা থেকে বিদ্বেষ, চাতুরি থেকে সরলতা–সব!

♦ জিম করবেটকে নিয়ে উপন্যাস লিখলেন, কিন্তু তাঁর একটা সবিস্তার জীবনী লিখলেও তো পারতেন...আমি শুনেছি আপনি কেনিয়ায় জিম করবেটের বোনের সমাধি অবধি খুঁজে বের করেছেন... অবশ্য উপন্যাসটি এখনও পড়িনি..

এটা জিম করবেটকে নিয়ে লেখা উপন্যাস, জিম করবেটের জীবনকথার উপন্যাসরূপ নয়। ফিকশনাল ওয়ার্ক হিসেবে এখানে আমার কল্পনা মিশেছে আবশ্যিকভাবেই। এটাকে কোনোভাবেই কেউ জীবনী হিসেবে পড়ুক আমি তা চাই না। নন ফিকশন ও ফিকশনের ভেতরের তফাৎ বিষয়ে মনের মধ্যে আমি একটা স্পষ্ট পার্থক্যরেখা গড়ে নিয়েছি।

♦ বাংলাদেশ ঘুরে কিছু লিখবেন?

এসেছি তো অল্প সময়ের জন্য...এতে কি আর তেমন অভিজ্ঞতা হয়!

এই অবধি আলাপের পর লিট ফেস্টের একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে তাঁকে তাড়া দিলেন, সেশন শুরু হতে মাত্র আর পনেরো মিনিট বাকি। তাই সেলফি তুলে বিদায় নিতে হল। ফিরবার সময় আমার কাঁধটা একটু চাপড়ে দিয়ে মৃদু হাসলেন। সেই হাসিতে আমি দেখতে পেলাম উষ্ণ আন্তরিকতার আভা।

সাক্ষাৎকার - মুহিত হাসান

লেখালেখিই আপাতত পেশা মুহিত হাসানের। মূলত সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে চর্চা করেন। প্রকাশিত বই: 'বিস্মৃত কথকতা: সেকালের বাংলার কতিপয় খণ্ডচিত্র'। সম্পাদনা করেছেন কবি শহীদ কাদরীর সাক্ষাৎকার সংকলন। বর্তমানে বরেন্দ্র অঞ্চলে সিপাহি বিদ্রোহের চালচিত্র ও প্রভাব নিয়ে কাজ করছেন।

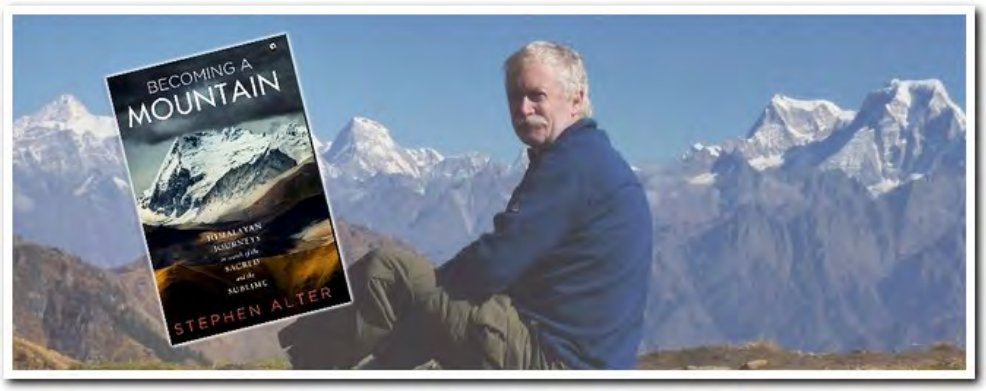

ছবি - স্টিফেন অল্টারের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - পঞ্চম পর্ব

আগের পর্ব – চতুর্থ পত্র

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

পঞ্চম পত্র

বন্ধুবর,

ফেরার সময় এগিয়ে আসছে আর ততোই মায়াময় রূপে আমায় মুগ্ধ করছে জড়িয়ে রাখছে লাদাখ। আগামীকাল ফেরা। আজকের দিনটা তাই নিজেদের ইচ্ছেমত কাটানো। পায়ে পায়ে মনখারাপ আর ভালোলাগা, ভালোলাগা আর মনখারাপ।

২০/১০/২০১৫, লে

আজ বিশ্রাম। লেহ শহরে হালকা ঘোরাঘুরি। সকালটা মেঘলা ছিল। ঘরের দেওয়ালজোড়া কাচের জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে চারপাশটা। তারপর একচোট শিলাবৃষ্টি হল। আজকে প্রথম হোটেলের ছাদে উঠেছিলাম। ততক্ষণে শিলাবৃষ্টি থেমে গেছে, অন্যরা নেমেও গেছে ছাদ থেকে। আকাশ একটু পরিষ্কার হলে ছাদ থেকে লাদাখ রেঞ্জের খয়েরি-বাদামি পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে লেহ প্যালেস চমৎকার লাগছিল। ঝলমলে রোদও উঠে গেল তার পরে।

একসময় তিব্বত আর চিনের সঙ্গে ব্যবসার পথ ছিল এই লে শহরের ভেতর দিয়ে। বেনারসের সিল্কও এই পথে পৌঁছাত সেখানে। কুষাণ আমলেই চিনের একটি ট্রেড রুট ছিল বলে বলা হলেও মূলতঃ দশম শতাব্দীর শেষের দিকে চিনের রাজপুত্র নিমা গোঁ পশ্চিম তিব্বত দখল করেন এবং শ্যে-র মূল স্থাপত্যগুলি তৈরি করেন। লেহ-র ১৫ কিমি পূর্বে শ্যে-তেই ছিল প্রাচীন লাদাখি রাজাদের প্রাসাদ। লেহ-র পথে বেরিয়ে এমনই সব পুরোনো ইতিহাস ভাবছিলাম। একসময়কার ট্রেডরুটগুলোই এখন কম-বেশি যাতায়াতের পথ হয়ে গেছে।
ব্রেকফাস্ট সেরে সকালে গেলাম লেহ প্যালেসে। পাহাড়ের গায়ে বালি রঙের ন'তলা প্রাসাদটিকে লেহ শহরের আনাচ কানাচ থেকে চোখে পড়ে। প্যালেসে তলার ওপর তলা, ফাঁকা ফাঁকা বড় বড় ঘর। প্রতি তলাতেই লাগোয়া ছাদ আর সেখান থেকে দেখা পাহাড়ে ঘেরা লেহ শহরের সৌন্দর্য খাড়া খাড়া সিঁড়ি ভাঙার ক্লান্তি ভুলিয়ে দিচ্ছিল। সমস্ত উপত্যকা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট বাড়িঘর। তাদের মধ্যে ভাল করে ঠাহর করলে দেখা যায় আমাদের গত ক'দিনের ঠিকানা ছোট্ট হোটেলটিকেও। অদূরে লাদাখ রেঞ্জের পাহাড়শ্রেণী। দূরের পাহাড় সাদা আর কাছের পাহাড়ে ছায়া পড়ে কালো অথবা রোদ্দুরে হলুদ। আকাশে নীল-সাদা মেঘ।

এখানে লেহ প্যালেসের ইতিহাস একটু ছোট্ট করে বলে নিই দাঁড়াও। সতের শতকে লাসার পোতালা প্যালেসের আদলে এই প্রাসাদটি তৈরি করা শুরু করেন রাজা সেওয়াং নামগিয়াল। তারই ভাইপো সেনগে নামগিয়াল, লাদাখের অন্যতম এক রাজা প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। তারপর দীর্ঘ সময় এটিই ছিল লে-র রাজাদের মূল প্রাসাদ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি দোরগা বাহিনির আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে রাজ পরিবার স্তোক প্যালেসে আশ্রয় নেয়। প্রাসাদের নিচের তলাটা ছিল আস্তাবল আর গুদামঘর। একেবারে ওপরে রাজাদের বাসস্থান। প্রাসাদের মন্দিরটি এখনও চালু আছে। জুতো বাইরে রেখে আধো অন্ধকারে দেখি চেনা-অচেনা বুদ্ধ মূর্তিগুলি।
প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। সংস্থাটির দায়িত্বে থাকা ভারতের অন্যান্য হেরিটেজ সাইটের ছবিওলা বড় বড় প্ল্যাকার্ড রাখা ফাঁকা ঘরগুলোতে। ছোট্ট প্যালেস মিউজিয়ামটি রাজাদের পোশাক-আশাক, ঢাল-তলোয়ার, পুঁথি-পত্র, থাঙ্কা,

অলঙ্কার এসব নিয়ে জমজমাট।
লেহ প্যালেসের পেছনে সেমো পাহাড়ের গায়ে সেমো মনাস্ট্রি। পনেরো শতকের প্রথম দিকে রাজা তাশি নামগিয়াল এই মনাস্ট্রিটি তৈরি করেন। এই গোম্ফার মূল আকর্ষণ তিন তলার সমান উঁচু সোনার মৈত্রেয় বুদ্ধ মূর্তিটি। এছাড়া অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রীর মূর্তিদুটিও একতলা সমান উঁচু।
প্যালেস দেখে বেরিয়ে গাড়ি ওঠে পেছনের পাহাড়ে মনাস্ট্রিতে যাওয়ার জন্য। যেখানে দাঁড় করালো সেখান থেকে সরু রাস্তা উঠে গেছে মনাস্ট্রিতে। খানিক দূর উঠে একটা চাতাল মতো জায়গা। এখনও অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে। ভবিষ্যৎ বুদ্ধের কাছে পৌঁছানোর আশা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেই ক্লান্ত আমি সেখানেই একটা উঁচু জায়গা দেখে বসে পড়ি।

সামনে অনেক নিচে পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় ঝলমল করছে লেহ শহর। তাকে সযত্নে দুহাত বাড়িয়ে বাইরের জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে শ্বেতশুভ্র স্তোক কাংড়ি পর্বতমালা - এও কি কম পাওয়া? সামনে দিয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে অনায়াসে চলে যায় পাহাড়ি নারী। কী আর করি মোবাইলেই ধরে রাখি তাকে।
মনাস্ট্রি বন্ধ। ওপর থেকে নেমে আসে অন্যেরা। কেউ কেউ অর্ধপথ থেকেই। ভাগ্যিস যাইনি। আহ্লাদিত আমি।

পায়ে হেঁটে এলোমেলো ভাবে শহর ঘুরতে বেশ লাগছিল। দোকানপাট, বাজার-হাট, স্থানীয় জনজীবন দেখতে দেখতে। বেশ জমজমাট শহর লেহ - প্রচুর দোকানপাট, পথেঘাটে অনেক লোকজন, গাড়িঘোড়া। অক্টোবরের শেষের দিকে

যদিও ট্যুরিস্টের সংখ্যা বেশ কমে এসেছে - যে ক'জন আছে তাদের মধ্যে বিদেশিদের সংখ্যাই বেশি। অনেক হোটেল দোকানপাট এবছরের মত ঝাঁপবন্ধ করে দিয়েছে। লোকজনের কেনাকাটারও প্রধান উদ্দেশ্য হল আসন্ন শীতের দিনগুলোর জন্য রসদসংগ্রহ। আর কিছুদিন পরেই লাদাখ অঞ্চল ভারতের বাকী এলাকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আকাশপথে ছাড়া। বরফে ঢাকা লেহ-এর প্রায় নির্জন পথ আবার খানিক জনমুখর হয়ে উঠবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি থেকে। তখন আসবে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ট্রেকাররা - জমে যাওয়া জাঁসকর নদীর বুকে 'চাদর ট্রেক'-এর জন্য। মূল বাজারের কাছাকাছি ছিলাম। পায়ে পায়ে চলে এলাম নতুন বাসস্ট্যান্ড। জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের হ্যান্ডিক্রাফটস সেন্টার থেকে টুকিটাকি উপহার কেনা হল। ফেরার পথে পথের ধারের দোকান থেকে রঙচঙে টুপি-গ্লাভস-মাফলার। বারবার হাত থেকে খুলে নিয়ে লেখার জন্য আমার ডান হাতের গ্লাভসটা মাঝে মাঝে হারাতে হারাতে এবার একেবারেই হারিয়ে গেছে। ওটা হারানোরই ছিল হয়ত। ডায়েরিটাও হারাই হারাই করছিল। তবে সেটা যে শেষপর্যন্ত হারায়নি, তা তো আমার এই দিনলিপি পড়েই বুঝতে পারছ।

বিকেল চারটে নাগাদ হোটেলের কাছেই একটা চমৎকার রেস্টুরেন্টে চিকেন উইংস আর হট চকোলেট খাওয়া হল। সকালে প্রায় এগারোটা নাগাদ আলুপরোটা দিয়ে ব্রেকফাস্টের পর। রোজ রোজ ব্রেড, বাটার আর ডিমসেদ্ধ/ওমলেট খেতে খেতে আমাদের হাল খারাপ। চুমকি আর টুসি দুই বোন মিলে একদিন হোটেলের রান্নাঘরে গিয়ে হোটেলের সবেধন নীলমণি কুক-কাম-বেয়ারা-কাম-গার্ড-কাম-ম্যানেজার ধনগিরিকে ডিমের পোচ বানানো শেখাতে চেষ্টা করছিল। বুই বলেছে, কলকাতায় ফিরে আর পাঁউরুটি, ডিম আর আপেল খাবে না!
তবে লেহ-র আপেল কোনদিন ভুলব না। আর ভুলব না ধনগিরি বোম ঠোকরিকে। মানুষটি প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান। জন্ম নেপালে। প্রথমেই ধর্মের কথা বললাম এই কারণে যে ধর্মকে আশ্রয় করেই মানুষটির যাপন। ভীষণ হাসিখুশি, আপন-পর ভেদাভেদহীন ধনগিরি যিশুভক্ত। বলেছিল, যিশুর নির্দেশেই দুহাজার চোদ্দ সালে ভারতে চলে আসে। খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে গিয়ে একাধিক জায়গায় আক্রান্তও হয়েছে। তবু ইচ্ছে ভবিষ্যতে নেপালে অনেক চার্চ প্রতিষ্ঠার। বর্তমানে অবশ্য বিয়ে করার ইচ্ছে, বয়স হয়ে যাচ্ছে কিনা, হাসতে হাসতেই জানিয়ে দেয় সে। এখানে তার একটাই দুঃখ যে হোটেল মালকিনের নিজের ছেলে আছে বলে ধনগিরিকে ছেলে ভাবে না সে। আর তাই তার সঙ্গে মান-অভিমানের পালা লেগেই আছে। রাতে নিজের লেখা পড়ে শোনায় ধনগিরি। একটা লম্বা খাতায় নিজের যা মনে আসে লিখে রাখে, আর সেঁটে রাখে খবরের কাগজে/পত্রিকায় যিশু সংক্রান্ত কোনও খবর বেরোলে তার কাটিং। কাল লেহ থেকে ফেরার পথে রওনা দেব আমরা, আমাদের যাত্রা তথা আগামীদিনগুলো যাতে শুভ হয় তার জন্য খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করে। ভাবি কতরকম মানুষ। ভালো মানুষ। এখনও আছে। তাই পৃথিবীটা আজও সুন্দর।

২১/১০/২০১৫, লে

সড়কপথে লেহ যাতায়াতের প্রচলিত পথ দুটি - একটা যেপথে আমরা ফিরলাম কার্গিল-জোজি লা-সোনমার্গ হয়ে লেহ-শ্রীনগর হাইওয়ে (মোটামুটি ৪৩০ কিমি) আর অন্যটা হিমাচল প্রদেশের ভেতর দিয়ে সারচু, রোটাং পাস হয়ে লেহ-মানালি হাইওয়ে (প্রায় ৪৮০ কিমি)। যে দিক দিয়েই যাওয়া যাক না কেন, অন্তত দিন দুয়েক সময় লাগে। পথে কার্গিল/সারচুতে রাত্রিবাস করতে হয়। দুটো রাস্তাই অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। সময় বাঁচানোর জন্য দিল্লি থেকে আকাশপথে এসেছিলাম লেহ, ফেরার সময় সড়কপথে আশপাশ দেখতে দেখতে যাব ঠিক করা ছিল আগে থেকেই। মানালির পথে সামান্য ঘুরে আসা হয়েছে সো-মোরিরি দেখার সময়। এবারে সকাল সাড়ে আটটায় লেহ থেকে কার্গিলের উদ্দেশে রওনা দিলাম। কার্গিল হয়ে শ্রীনগরে ফিরব। সেখান থেকে দিল্লি।

ঝকঝকে সকাল আর কনকনে ঠাণ্ডা। যতক্ষণ চোখ গেল স্তোক-কাংড়ি পর্বতমালাকে দেখতে লাগলাম। সকলেরই মন খারাপ। 'আবার আসিব ফিরে ভাব'-ও বটে। তবে শ্রীনগর/মানালি যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা থাকলেও বাকী লাদাখে জনপরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় পুরো ঘোরাঘুরিতেই গাড়ি ভাড়া করতে হয় বলে এই বেড়ানো বেশ খরচসাপেক্ষ। জীবনে একবার আসাই হয়তো আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের জন্য যথেষ্ট। তবে ইচ্ছে যে করে সে তো সত্যি। কতকিছুই তো দেখা হল না এই যাত্রায়। ওই যে লাল-নীল-হলুদ ছাদওলা বাড়িগুলোর কোনোটায় খানিকক্ষণ থাকার ইচ্ছে হয়েছিল, সেও তো হল না।

লেহ এয়ারপোর্ট ছাড়ালে প্রকৃতি মরুসদৃশ। দুপাশে ছড়ানো উপত্যকা, মাঝখান দিয়ে কালো পিচের রাস্তা সোজা চলে গেছে দিগন্তে। পথে পড়ল পাথরসাহিব গুরুদোয়ারা, ম্যাগনেটিক হিল। একবার শুধু খানিকক্ষণ দাঁড়ানো হল জাঁসকর-সিন্ধুর সঙ্গমে। রাস্তার থেকে অনেক নিচে সবুজ রঙের জাঁসকর এসে মিশেছে নীল সিন্ধুতে। সিন্ধু তাই আহ্লাদে এঁকেবেঁকে নেচে চলেছে যেন। দূর থেকেই চোখ আর প্রাণভরে দেখি। ইচ্ছে করে কাছে গিয়ে নীল-সবুজ জলের মিলনস্থল ছুঁয়ে আসি একটু। কিন্তু সময় নেই যে। সাড়ে নটায় নিম্মুতে ব্রেকফাস্ট। নিম্মুর পরে বাসগো রুইনস। লোয়ার লাদাখের একসময়ের রাজধানী বাসগোতে নামগিয়াল রাজাদের স্থাপিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ, মনাস্ট্রি দেখা হলনা সময়ের স্বল্পতায়। যদিও মাটি-পাথরের তৈরি এই কেল্লার ভগ্নাবশেষ ও আশপাশের রুক্ষ প্রকৃতি ফোটোগ্রাফারদের অবশ্য গন্তব্য। অনেক হিন্দি সিনেমার শুটিংও হয়েছে এখানে। তারপরেও খানিকটা চলে এসেছি। লেহ ইউনিভার্সিটিও পেরোলাম। বরফ পাহাড় সঙ্গী। পথের ধারের হলুদ গাছের সারি কখন যেন ফুরিয়ে গেছে। দুপাশের দৃশ্য এখনও শীতল মরুর মতই। সৌম্য বলছে, মঙ্গল গ্রহ। চন্দনদা জিজ্ঞাসা করল, কবে গিয়েছিলি?

সকাল সাড়ে দশটা, লিকির মনাস্ট্রি

লেহ -কার্গিল পথে পরপর বেশ কয়েকটা বৌদ্ধ গুম্ফা পড়ে। তারই একটা লিকির মনাস্ট্রি।

মূল রাস্তা থেকে পাঁচ কিলোমিটার সরে এসেছি। সামনে একজোড়া বরফ পাহাড়। লেহ শহর থেকে পশ্চিমে মোটামুটি ৫৫ কিমি দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় নির্জনে রয়েছে লিকির গ্রাম আর মনাস্ট্রি। একসময় যদিও এটা ট্রেডরুটে পড়ত। তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের গেলুকপা সেক্টের এই বৌদ্ধ গুম্ফাটির প্রতিষ্ঠা করেন লামা দুয়াং চোসজে, রাজা লাচেন গিয়ালপো-র আমলে।

এবারে লিকিরের ইতিহাসের খাতাখানা খুলি দাঁড়াও। লাদাখি গল্প-কাহিনিতে লিকিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। লিকির মানে জড়ানো সাপ। যা দুই বিখ্যাত নাগরাজ নন্দ ও তাকসাকোর আত্মার শরীরী রূপ।

১৯০৯ সালে এক পর্যটক গবেষক লিকির গুম্ফার দেওয়ালে লেখা ইতিহাসের কাহিনিটি উদ্ধার করেন। সেই কাহিনি অনুযায়ী রাজা লা-চেন-রিগিয়াল-পো এগার শতকে মনাস্ট্রিটি নির্মাণ করেন। পনেরো শতকে বিখ্যাত সংখাপা লামা লাওয়াং-লোদস-সাংফু মনাস্ট্রির লামাদের কদমপা অর্ডার থেকে গেলুকপা অর্ডারে রূপান্তরিত করে মনাস্ট্রিটিকে নতুন করে গেলুকপা মনাস্ট্রি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। লা-চেন-রিগিয়াল-পো-র সাত জেনারেশন পরে ক্ষমতায় আসেন লা-চেন-গস-গ্রাব। তিনি শিক্ষার্থীদের লাসায় পাঠানোর চল শুরু করেন। আঠেরো জেনারেশন পরে রাজা হন দে-লেগস-মাম-রিগিয়াল। কিন্তু এঁর নাম সেই ইনস্ক্রিপশন থেকে জোর করে মুছে দেওয়া হয়েছিল। বাসগোর যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন এই বৌদ্ধ রাজা। এরও প্রায় একশো বছর পরে দ্বিতীয় থে-ব্যাঙ-মাম-রিগিয়াল মনাস্ট্রিটির সংস্কার করেন। গুম্ফার নিচে একটি বড় চোর্তেন আছে যার ভেতরের ফ্রেসকোতে সংখাপা ও তাঁর সমসাময়িক লামাদের ছবি

রয়েছে। চোর্তেনের দরজার মাথায় প্রাচীন এক লামার অদ্ভুত এক ছবি রয়েছে। চোর্তেনের নিচের ভাগের চৌকোনো ঘরটিকে প্রাচীন মন্দির বলা হয়, মনাস্ট্রি প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই সেটি ছিল। মনাস্ট্রির ওপরে পঁচাত্তর ফিট উঁচু একটি সোনালি বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। দেওয়ালজোড়া ফ্রেস্কো, নানান রঙের থাঙ্কা, আর প্রচুর পুঁথি নজর কাড়ছিল। দুটি প্রার্থনা হল। পুরোনো হলটিতে রয়েছে বোধিসত্ত্ব, অমিতাভ এবং শাক্যমুনি, মৈত্রেয় ও সাংখাপার তিনটি বড় মূর্তি। প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন নতুন হলঘরটিতে ঢুকতেই চোখ আটকে গেল অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটায়। এগারটা মাথা আর এক হাজারটা হাত। মাথা তো গোনা যাচ্ছে। হাত গোণার আর চেষ্টা করিনি। পাশেই পুঁথি রাখা থাকে থাকে। পুঁথি দেখলেই মনে হয় না জানি কী রহস্য লুকিয়ে আছে ওই সব প্রাচীন পুঁথির পাতায়। কত না অজানা কাহিনি। কে জানে!

বেলা ১১-৪০, আলচি মনাস্ট্রি

আলচি যেতে সিন্ধুর ওপরে ব্রিজ পেরোতে হল। এখানে সিন্ধু বেশ চওড়া। আবার বেশ গাছপালা চোখে পড়ছে। মূল রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরদিকে আলচি মনাস্ট্রি। আসলে আলচি গ্রামের মধ্যে। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস দশম শতকে এই মনাস্ট্রিটি তৈরি করেন গুরু রিনচেন জাংপো। কিন্তু মনাস্ট্রির দেওয়ালের লিখন অনুযায়ী ১১ শতকে মন্দিরগুলি তৈরি করেন এক তিব্বতীয় জ্ঞানী পুরুষ কাল-দান শেস-রাব। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, দশম শতকে তিব্বতের রাজা ইয়েশে ওড অফ গুগে ট্রান্স হিমালয়ান অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের জন্য একুশজন জ্ঞানী মানুষকে পাঠান। এরমধ্যে মাত্র দুজন প্রাণে বাঁচেন। এঁদের একজন রিনচেন জাংপো লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ ও সিকিম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটান। তিনি নেপাল আর ভুটানেও গিয়েছিলেন। পনেরো শতকে এই মনাস্ট্রিটি লিকিরের গেলুকপা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ্রামে ঢোকার মুখে একটা প্রাচীন গাছ। একটু এগিয়ে একটা কিউরিও-এর দোকান – তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নানান সামগ্রী তাতে। জিনিসগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, দামও তেমনই চড়া। এটাওটা নাড়াচাড়া করে দেখে একটা ছোট্ট আঙটি কেনা হয়। তারপর টিকিট কেটে গুম্ফা চত্বরে ঢুকি। কোনদিকে যে যেতে হবে বুঝতে পারি না। কোনটা মন্দির কোনটা না মালুম হয় না। আসলে চত্বরের ভেতরে আলাদা আলাদা একাধিক বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেসব আবার তালাচাবি দেওয়া।

চমকে দেওয়ার মতো কাঠের সুন্দর কারুকাজ মূল গুম্ফার বাইরের দেওয়ালে আর ছাদে। ভিতরের দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলি কাশ্মীরি শিল্পীদের আঁকা। সেইসময়ের কাশ্মীরের রাজারা ছিলেন হিন্দু। আবার শিল্পীরা অনেকে ইসলাম ধর্মীয়ও ছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলামধর্ম তিনেরই প্রভাব পড়েছিল তাই সমসাময়িক আঁকায়। তবে কাশ্মীরি ঢঙটাই প্রবল নাক, চোখ আর দাড়ির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। আবার প্রার্থনা হল বা দুখাং-এ একটা টানা সিরিজ রয়েছে উচ্চবংশীয়দের শিকার আর খাওয়াদাওয়ার – তাদের পোশাক, পাগড়িতে পারসী কাজের ছাপ। ভেতরে ফোটো তোলা নিষেধ। পাহারাদার রিজদিং এব্যাপারে খুব সতর্ক। তার হাতেই মন্দিরের চাবির গোছা। বহু ভাঁজে ভরা মুখ, চোখের দৃষ্টি, কঠোর। আর মেজাজ একেবারে সপ্তমে বাঁধা।

প্রথমে সামটসেক মন্দিরে। তিনতলা মন্দিরের একতলাতেই শুধু পর্যটকদের ঢুকতে দেওয়া হয়। মন্দিরের বাইরের বারান্দায় কাঠের বিমের কারুকাজ আর বারান্দার ওপরে সামনের দিকে মৈত্রেয়, অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রী বুদ্ধের কাঠ খোদাই মূর্তি ফ্রেমে আটকানো। কাঠের ফ্রেমের দরজাটা এতই নিচু যে মনে হচ্ছিল তা যেন কোনও হবিটের জন্য বানানো। ভেতরটা অন্ধকার আর ধূপ আর প্রদীপের তেল পোড়া গন্ধ। একটা অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশ। বেশ খানিকক্ষণ লাগল চোখ আর মনকে ওই আলোয়, ওই আবহে সইয়ে নিতে। মাথার ওপর কাঠের বিমের গায়ে নানা রঙের আঁকা। মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে কালো, সবুজ, গেরুয়া, সোনালি – বসে থাকা হাজার বুদ্ধমূর্তির ফ্রেসকো। ঘরের একেবারে শেষে ১৭ ফুট উঁচু বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র মূর্তি। চার হাত, মাথায় মুকুট, পরনে ধুতি। একতলা ছাড়িয়ে মূর্তিটির মাথা দোতলায় উঠে গেছে। সামনের বৃহৎ কুলুঙ্গিগুলোর এক একটায় এক একটা বিশালকায় মূর্তি। ঢুকে বাঁ হাতে অবলোকিতেশ্বরের বিশাল সাদা রঙের মূর্তি। চারটে হাত। মাঝে লাল রঙের মৈত্রেয় বুদ্ধ। ডানদিকে হলুদ রঙের মঞ্জুশ্রী। এই মূর্তিগুলিও বিশাল। ধুতিতে ছবি আঁকা রয়েছে। মাঝে চোর্তেন। অবলোকিতেশ্বরের ধুতিতে আঁকা ছবির বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করছেন যে এতে ১১-১২ শতকের কাশ্মীরি মন্দির, প্রাসাদ ও বাড়িঘরের ছবি আঁকা রয়েছে। যেহেতু ওই সময়ের কোনও সত্যিকারের বাড়িঘর আজ আর টিকে নেই। তাই অবলোকিতেশ্বরের ধুতিটিই একমাত্র সেইসময়ের কাশ্মীরকে চেনার একমাত্র উপায়। মৈত্রেয় বুদ্ধের ধুতিতে বুদ্ধের জীবনকথা আঁকা রয়েছে। আর মঞ্জুশ্রীর ধুতিতে তন্ত্রসাধনার ছবি। মূর্তিগুলির পাশে উড়ন্ত দেবীরা। সামটসেক মন্দিরের বিমগুলিতে সম্ভবত সেইসময়ের জামাকাপড়ের নকশা আঁকা আছে। এগুলোও মধ্যযুগের কাশ্মীরি বয়নশিল্পের শেষ উদাহরণ। সবুজ রঙের তারামূর্তি রক্ষাকর্ত্রীর রূপে। এর চোখের টান হঠাৎ করে অজন্তার কৃষ্ণা সুন্দরীকে মনে করিয়ে দেয় যেন।

প্রার্থনা হল বা দু-খাং এখানকার প্রাচীনতম নিদর্শন। দু-খাং-এর একেবারে পেছনের দেওয়ালে রয়েছে প্রাচীনতম বুদ্ধ বা ভৈরোকানার চারটি উজ্জ্বল রঙিন ফ্রেসকো। বাকি দেওয়ালে ছটি মন্ডল রয়েছে। মন্ডলগুলির মধ্যে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও নানান দেব-দেবীর ছবি রয়েছে।

মঞ্জুশ্রীর মন্দিরটির ঢোকার দরজা আরও নিচু ভেতরটা আরও রহস্যময়। চোখটা একটু ধাতস্থ হতে তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের যে কোনওদিকে তাকালেই এত বিচিত্র ছবি আর তার রঙের বাহারে কিছুক্ষণ চোখ-মন সব যেন ধাঁধিয়ে যায়। মঞ্জুশ্রীর চারটি মূর্তি পরস্পর পিঠ ঠেকিয়ে সংলগ্ন।

ক্যামেরায় ছবি তোলা তো নিষেধ। ওদিকে মনের ক্যামেরার সব ছবি একের ওপর অন্যে ওভারল্যাপ করে শুধু। এও মনে রাখতে হলে অজন্তার মতো সময় নিয়ে দেখতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে, বুঝতে হবে। নাহলে অসম্ভব। সত্যি বলতে কী অজন্তার সৌন্দর্য দেখার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি থাকে তা এর বেলায় না থাকায় আমি রীতিমতো হতবাক আর অসম্ভব মুগ্ধ হয়েছি। এককথায় বললে সেই লালমোহনবাবুর 'জমজমাট'-

এর মতোই অবস্থা। কী করে যে সে ছবি কলমে ধরব তা নিজেও জানি না। একেকটা মন্দিরের ভেতরের অদ্ভুত শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ, প্রাচীন গন্ধ, রঙিন ছবি, আলো-ছায়া – এ যেন অন্য এক ভুবনে পৌঁছে যাওয়া।

তবে পরে জেনে খুব মনখারাপ লাগল যে, আলচি মনাস্ট্রির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে ভারতীয় প্রত্নবিভাগ ও লিকির মনাস্ট্রির মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। ওদিকে আবহাওয়ার বদল আর মানুষের নিঃশ্বাসের বিষ অজন্তার মতোই ক্ষইয়ে দিচ্ছে এর অমূল্য চিত্রগুলিকে। পাশেই বাঁধ আর নদী, ফাটল ধরেছে জায়গায় জায়গায়। যে কোনও সময় একটা ভূমিকম্পেই ধ্বসে পড়তে পারে প্রাচীন ইতিহাসে মূর্ত এই মনাস্ট্রিটি।

আলচি থেকে বেরিয়ে আবার চলা। সিন্ধু চলেছে আমাদের সঙ্গে বাঁ হাতে। ঝকঝকে নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ। এখনো বেশিটাই রুক্ষ পাহাড়, মাঝে মাঝে এক আধ ঝলক রঙিন গাছ। রাস্তা যথারীতি প্রায় খালি। কখনও এক-দুটো ট্রাক চোখে পড়ছে। পথের পাশে কখনও বা স্থানীয়দের বাসস্থানের এক ঝলক। সন্তান কোলে মা। কোথাও রাস্তা সারাই চলছে।

বেলা ১টা, উলেটোকপো

ভারী সুন্দর জায়গাটা। গাছের রঙে রঙে একেবারে রঙিন ঝলমলে হয়ে আছে পথ। লেহ-এর থেকে নিচুতে, তাই সমতল থেকে আকাশপথে সরাসরি লেহ এলে কেউ কেউ এয়ারপোর্ট থেকে লেহ শহর না গিয়ে এখানে এক রাত কাটিয়ে যান উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে।

বেলা পৌনে দুটো, খালাৎসে

বেশ জমজমাট জায়গা। পথের পাশে অনেক হোটেল-রেস্টুরেন্ট। জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতের সময় এখানেই দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারেন যাত্রী ও গাড়িচালকরা। সান অ্যান্ড মুন গার্ডেন রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সারা হল। রেস্টুরেন্টের পিছন দিকে আপেল বাগানে গাছের ছায়ায় ওপেন এয়ার খাওয়ার জায়গা। বাগানে বসে খেতে খেতে ফলন্ত আপেল গাছের দিকে তাকিয়ে লেহ-এর হোটেলের আপেলগাছের কথা মনে পড়তে দীর্ঘশ্বাস – আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?

সোয়া তিনটে, মুনল্যান্ড

কী অদ্ভুত এখানকার ভূ-প্রকৃতি। ফিকে হলুদ রঙের পাহাড় যেন ছবিতে দেখা এবড়োখেবড়ো রুক্ষ চাঁদের ভূমি।

সাড়ে তিনটে, লামায়ুরু মনাস্ট্রি

লাদাখের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন মনাস্ট্রি লামায়ুরু। আলচি মনাস্ট্রির সমসাময়িক। প্রচলিত গল্পকথা এই যে আগে পুরো উপত্যকা জুড়ে একটি হ্রদ ছিল। এখানে একটি মনাস্ট্রি তৈরি করার জন্য জলদেবতা নাগের আত্মার কাছে প্রার্থনা করলে ও ভুট্টাদানা দিলে তাঁর আশীর্বাদে সমস্ত জল শুকিয়ে যায়। দশম শতাব্দীর শেষে গুরু নারোপা এখানে আসেন এবং দু-খাং-এ প্রার্থনা করেন। গুরু রিনচেন জাংপো এখানে অনেকগুলি মন্দির ও স্তুপ তৈরি করেন এবং দীর্ঘদিন ছাত্রদের শিক্ষা দেন। গুরু তিলোপা ও গুরু নারোপার অনুগামী ব্রিগুংপা সেক্টের অন্তর্ভুক্ত এই মনাস্ট্রিটি। প্রার্থনা হল পেরিয়ে বুদ্ধ ও বিভিন্ন গুরুর মূর্তি সাজানো রয়েছে অধিকাংশ মনাস্ট্রির মতোই। বাঁ দিকে প্রথমে গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি। ডান হাতে প্রথম মূর্তিটি বুদ্ধের।

ভেতরের ঘরে অজস্র পুঁথি। ত্রিপিটকও রয়েছে তার মধ্যে। কয়েকটা বেশ অদ্ভুত মূর্তিও চোখে পড়ল। আসলে তান্ত্রিকমতে বুদ্ধ পূজিত হলে সেইসব গুম্ফায় বিচিত্র সব মূর্তি চোখে পড়ে। ধর্মপাল, সম্ভবত সিংহের ওপর বসে থাকা বৈশ্বরণ, তারা, চার হাতবিশিষ্ট মহাকাল, বজ্রধারা বুদ্ধ, শাক্যমুনি বুদ্ধ।

গুরু নারোপা যে ঘরে ধ্যান করতেন সেই ঘরটিতে এখন লাইব্রেরির মতো পুঁথি সাজানো রয়েছে।

বিকেল সোয়া চারটে, ফোতু লা

লেহ-শ্রীনগর পথে সর্বোচ্চ গিরিপথ – ১৩৪৭৯ ফুট। পথের ধারে বরফ জমে আছে। ভিউয়িং পয়েন্টের চাতালে দাঁড়ালে দূরে কারাকোরাম পর্বতমালা ঘিরে আছে চারপাশ। কিন্তু হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, মনে হচ্ছে চাতাল থেকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে নিচের খাদে। ক্লান্ত লাগছে খুব।

বিকেল পাঁচটা, নামিকা লা – ১২২০০ ফুট

সূর্য নেমে আসছে। পাহাড়ের বুকে আলোছায়া খেলা করছে। আর লেখার শক্তি নেই। ঘুম পাচ্ছে খুব।

সন্ধে সাড়ে পাঁচটা, মূলবেখ

পাহাড় খোদাই করে তৈরি মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু একটা মূর্তি পথের ধারে। নিচের দিকটা ঢাকা পড়েছে ছোট্ট মন্দিরে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, তবু দিনের আলোর শেষ রেশটুকু রয়ে গেছে এখনো। দুটো গুম্ফা এখানে - একটি দ্রুকপা ও অন্যটা গেলুপা সম্প্রদায়ের। ভিতরে প্রায়ান্ধকারে টিমটিম করে প্রদীপ জ্বলছে। প্রাচীন বানিজ্যপথ আর আজকের হাইওয়ের ধারে পাহাড়ের গায়ে কুষাণযুগে খোদিত এই দীর্ঘকায় ভবিষ্যৎ বুদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হল বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিদের কথা - ধর্ম মানুষকে যত কিছু দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে কি তার থেকে বেশি মনুষ্যত্ব?

সন্ধে সাতটা, কার্গিল

কার্গিল পৌঁছে হোটেল ঠিক করতে করতে একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে এসেছে। রাস্তাঘাটে আলোও নেই বিশেষ। তবে অফসিজন হওয়ায় বেশ কম ভাড়াতে ভাল হোটেলই পাওয়া গেল। যদিও চা-কফি ছাড়া খাবার কিছু মিলবে না। রাঁধুনি এ বছরের মত ছুটি নিয়েছে। অনতিদূরের রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে এসে ডাইনিং রুমে খাওয়া যাবে। আপাতত আজ রাতের মতো এখানেই বিশ্রাম। লেহ-এর হোটেলে ফ্রি ওয়াই-ফাই ছিল, কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগের হাল খুব খারাপ। এখানে পৌঁছেই তাই ছোট-বড় সবাই হোটেলের ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে মোবাইল ফোন হাতে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে গত কয়েকদিনের অনিয়মিততার ঘাটতিপূরণে ব্যস্ত!

(ক্রমশ)

আগের পর্ব - তৃতীয় পত্র

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

লেখালেখি, বেড়ানো, নানা রকম বই পড়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় যাওয়া, কখনোবা গলা ছেড়ে গান গাওয়া এইসবই ভালো লাগে 'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্তের।

বর্ষায় অরণ্যে

অরিজিত কর

~ *বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যের আরও ছবি* ~

বেথুয়াডহরি পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। এদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। পথে বৃষ্টিও পেলাম। শঙ্করদাকে মধ্যাহ্নভোজের অর্ডারটা দিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে বেশ গুছিয়ে বসলাম। ঠিক করলাম, বিকেলের দিকে একটু বেরোব অরণ্যের অনুভূতিটা নেওয়ার জন্য। অবশ্য প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময় ফরেস্টের কর্মচারীদের অতিথিবৎসলতায় মুগ্ধ হয়ে কিভাবে কখন ঘুরব, তার পরিকল্পনাটা তখনই করে ফেলেছিলাম। বেশ ভি.আই.পি. ট্রিটমেন্ট। বাইরের ভিজিটরদের জন্য গেট তখনো বন্ধ। অনলাইন বুকিং-এর কাগজটা দেখাতেই স্বাদর অভ্যর্থনা। একটু গল্প করে জানলাম বাইরের দর্শকদের জন্য দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত গেট খোলা থাকে বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে। যেহেতু ফরেস্ট বাংলো বুক করেছি, আমার জন্য অরণ্য সারাক্ষণ খোলা। কখন কিভাবে এই গহন অরণ্যের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করব, তা নিজের ওপর। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই যখন বাইরের পর্যটকদের পালা শেষ হবে, আমার অভিযান শুরু হবে। বুঝলাম বিকেল পাঁচটার পর থেকে ১৬৭ একরের বেথুয়াডহরি শুধু আমার আর ফরেস্টের গুটিকয়েক কর্মচারীর দখলে!!

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনও এক সন্ধে। বর্ষা এসে গেছে। চপ-মুড়ি খেতে খেতে মনটা খালি টানছিল অরণ্যভ্রমণের জন্য। ভাবছেন বর্ষায় অরণ্য তো বন্ধ। ঠিকই। ডুয়ার্সের সমস্ত অরণ্য বন্ধ বর্ষায়। কিন্তু বর্ষায় জঙ্গলের যে রূপ তা যে অন্য কোনও সময় খুঁজে পাব না। সেই রূপের খোঁজেই খুঁজে পেলাম বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য। বন্ধ থাকে না বর্ষায়। হোক না মাত্র ১৬৭ একর। তবু তো সে অরণ্য। হরিণ, ঘড়িয়াল, টার্টল, গোসাপ, পাইথন, শেয়াল (এটা বনকর্মীদের কথানুযায়ী) এবং প্রচুর পাখি - এসব তো পাবই। তাই বেথুয়াডহরি।

অল্প বিশ্রাম নিয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বেরোলাম। সঙ্গে শুধু ক্যামেরা এবং অবশ্যই একটি প্লাস্টিক প্যাকেট (ঠেকে শিখেছি বৃষ্টি না পড়লেও একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট সঙ্গে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অসময়ে ক্যামেরা রক্ষার্থে)। জুন মাসের সাড়ে পাঁচটা হলেও আলো খুবই কম কারণ মেঘেদের আন্দোলন তখনও শেষ হয়নি। কটেজ থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের সরু রাস্তা ধরলাম। একটু সোজা হেঁটে বাঁ দিকের আরও সরু রাস্তা নিলাম। কয়েক পা এগোতেই অনুভব করলাম আমার দিকে কে যেন তাকিয়ে আছে! আই অ্যাম বিয়িং ওয়াচড... মুখ তুলেই বুঝলাম বেথুয়াডহরি আসার প্রথম সার্থকতা পেয়ে গিয়েছি। হ্যাঁ, ঠিক পনেরো ফুট দূরেই সেই ফালি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এক হরিণ শাবক।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে ক্যামেরার লাইট মিটারে চোখ রেখে বুঝলাম ট্রাইপডটা না এনে বেশ ভুল করেছি। আই এস ও বেশ খানিকটা বাড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। যাইহোক, ম্যানুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে বেশ চমকে গেলাম। শাবকের পাশে তার মা। তার শিঙের বাহার দেখে প্রথম দর্শনে একটু ভয় লাগবেই। এ তো আর চিড়িয়াখানা বা ডিয়ার পার্ক নয়। হরিণ এবং আমি - একই অরণ্যের সহবাসী এখন। যদি তাড়া করে, বর্ষায় পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে জোরে ছোটাও যাবে না। তবে ওরকম কিছুই হল না। মা হরিণটা তার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিক্ষেপ করে আমার নড়াচড়া খেয়াল করছিল। বুদ্ধি বলছিল, একজায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা উচিত যাতে বুঝতে পারে যে, ওদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। এক-দুটো ফটো নিয়ে... এক পা এগোলাম। এগিয়েই বুঝলাম ভুলটা করে ফেলেছি। মা এবং শাবক দুজনেই একছুটে গহীন অরণ্যে মিশে গেল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বেথুয়াডহরির অরণ্য আয়তনে ছোট হতে পারে কিন্তু গভীরতা কোনও অংশে কম নয়। দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও অরণ্যের বেশিরভাগ জায়গা অন্ধকার।

ঠিক করলাম, আরও সতর্ক পায়ে এগোতে হবে। এগিয়ে চললাম সেই ফালি রাস্তা ধরে গভীরে... আরও গভীরে। আলো বেশ কমে এসেছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক - প্রচণ্ড কানে লাগছে। অরণ্যের এই এক বৈশিষ্ট্য। একটু গভীরে এলেই নিস্তব্ধ চারদিক। যেন পিন পড়লেও শোনা যাবে। আশপাশের গাছগুলো আধো অন্ধকারে যেন একেকটা রহস্যময় জীব। বেশ গা ছমছম করছে। নিজের মনকে বোঝালাম এই অরণ্যে হিংস্র প্রাণী নেই। হরিণ তো আর মানুষ খায় না। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল বনকর্মীর কথা - গোসাপ, পাইথন, শেয়াল!!! সতর্ক হয়ে এগোতে থাকলাম। আমার চোখ দুটো স্তরে ঘোরাফেরা করছে। সামনে হরিণ দেখার পিপাসায়। আর নীচে পাইথন বা গোসাপের ভয়ে।

সেই ফালি রাস্তা ঘুরে ঘড়িয়াল পুকুরের দিকে যায়। সেখানে এসে দেখি দুটি ঘড়িয়াল আপত্তিজনক অবস্থায় বিরাজমান। দুইজনে চুমু খাচ্ছেন কিনা বুঝলাম না। আমার দিকে অবশ্য তেনাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এদের বিদায় জানিয়ে এগোতে থাকলাম। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। গায়ে না পড়লেও বুঝতে পারছি আওয়াজে... পাতায় পাতায় । ক্যামেরা তখনও ব্যাগে ঢোকাইনি কারণ অরণ্য এত গভীর যে বৃষ্টি খুব জোরে না পড়লে গায়ে লাগবে না। এমন সময় একটা আওয়াজে চমকে উঠলাম। ঠিক ডানপাশের ঝোপগুলোতে খসখস করে একটা আওয়াজ হল। বেশ জোরে। ওটা হাওয়া বা বৃষ্টি নয়। কিছু একটা নড়ে চলে গেল। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলাম না। একা হাঁটছি। একটু ভয়ও পেলাম এবার। এগিয়ে

চললাম। দশ পা এগিয়েই বুঝলাম কার আওয়াজ শুনেছি। সামনে কুড়ি ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে শিংধারী বেশ বড়ো মাপের একটা হরিণ। একেবারে রাস্তার মাঝামাঝি। আলো এত কম, জানি ফটো ভালো আসবে না। যতটা আই এস ও বাড়ানো যায় বাড়িয়ে, ছবি নিলাম।

আর দাঁড়াইনি। এইবার একটু জোরেই পা চালালাম কারণ বৃষ্টি বেশ বেগেই পড়ছে ততক্ষণে। ক্যামেরা প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছি। দেখতে দেখতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। সে কী আওয়াজ। অরণ্যের বৃষ্টি এক অন্য জিনিস। আমার হাতে উপায় দুটো। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যেখানে বৃষ্টি গাছের ঘনত্ব ভেদ করে অতটা ঢুকছে না। নতুবা ভিজে ভিজে বাংলোতে ফেরা। দু-পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়টাই বেছে নিলাম। ক্যামেরার প্যাকেটটা বুকে জাপটে ধরে সজোরে পা চালালাম বাংলোর দিকে। ফিরে শঙ্করদাকে দিয়ে গরম চা আর ফুলুরি আনিয়ে বেশ ধাতস্থ হলাম।

ঘুমটা ভালোই হল রাত্রে। গরমের লেশমাত্র ছিল না। বৃষ্টি প্রায় সারারাত হয়েছে। সকাল সাতটার মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম জঙ্গলের মধ্যেই একটি মিনি জু-তে। নীলগাই, ময়ূর, পেন্টেড স্টর্ক, বাঁদর, খরগোশ ইত্যাদিতে ভরা এই ছোট্ট চিড়িয়াখানা। বাইরের দর্শকদের হরিণ দেখার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ তাঁদের দেখার ওই সময়টুকুতে তেনারা গভীর জঙ্গলেই থাকতে অভ্যস্ত। বাইরের জনতার জন্য এই মিনি জু-টাই প্রধান আকর্ষণ। জানতাম যে সকালের দিকে হরিণকে খেতে দেওয়া হয়। ওদের কিছু কিছু জায়গা আছে। সেই জায়গাগুলো খাবার ঢেলে দিয়ে বনকর্মীরা চলে যায়। আগের দিন বিকেলে বেরিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম কোথায় কোথায় এই খাওয়ার জায়গাগুলো আছে। খুব সহজেই আজ হরিণের দেখা পেয়ে গেলাম সেখানে সেখানে।

প্রথম জায়গাটায় গিয়ে দেখলাম গোটাছয়েক হরিণ একসঙ্গে। আমাকে দূর থেকে দেখে সতর্ক হয়ে গেল ঠিকই তবে পিছটান মেরে দৌড় দিল না। বরং একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। খেয়াল করলাম, বাকিরা যখন খেতে ব্যস্ত, কোনও একটি হরিণ কান খাড়া করে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে। প্রতিটা পদক্ষেপ ও মাপছে। মনে হচ্ছে ও যেন দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে। কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরত্বে আমার সামনে খোলা স্বাধীনভাবে হরিণের সংসার। মনের সুখে ছবি তুলতে লাগলাম। একটা খাবারের জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। ছবি তুললাম। ওদের ব্যবহারগুলো বোঝার চেষ্টা করলাম। বেশ একটা ছন্দ আছে। আর হ্যাঁ, সদা সতর্ক। সামান্যতম আওয়াজেই সবাই খাবার ছেড়ে মুখ উঁচু করে বোঝার চেষ্টা করছে কোনও বিপদ ধেয়ে আসছে কিনা। বেশ লাগছিল দেখতে। একটু পরে হাঁটা লাগালাম অন্য দিকের খাবারের জায়গাটার দিকে। এসে দেখলাম এ তো পুরো হরিণের একান্নবর্তী পরিবার, কে নেই সেখানে!! আর দলবদ্ধভাবে আছে বলেই হয়তো দুঃসাহসটাও একটু বেশি... আমাকে অনেকটা কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি দিল এইবার!! প্রাণ ভরে এক-একটা করে কম্পোজিশন সাজালাম ভিউফাইন্ডারে আর লেন্সবন্দি করলাম তাদের। এবার ফেরার পালা। বাংলোতে ফিরে রেডি হয়ে ঠিক উল্টোদিকের নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারটা একবার চাক্ষুষ দেখে বাস ধরে চলে এলাম কৃষ্ণনগর সদর। সেখান থেকে টোটোতে কৃষ্ণনগর স্টেশন। কৃষ্ণনগর লোকাল। এক সুন্দর, সুস্থ, বর্ষাস্নাত অরণ্যসুন্দরীর প্রেমে আসক্ত হয়ে... আবার ফিরে আসার আশা নিয়ে বেথুয়াডহরিকে বিদায় জানালাম।

~ *বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যের আরও ছবি* ~

পেশাগত ভাবে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত অরিজিত করের ভালোলাগা বা প্যাশন হল ফোটোগ্রাফি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের ঘোরার অভিজ্ঞতা এবং বেড়ানোর ছবিগুলো নিয়ে একটি নিজস্ব ট্রাভেল ব্লগও লেখেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মেঘ ছুঁয়ে কল্পেশ্বরে

সুমন্ত মিশ্র

~ কল্পেশ্বরের আরও ছবি ~

কুঁয়ারিপাস থেকে ফিরেছি কালই, আজ যাব কল্পেশ্বর। আজ অষ্টমী, বাড়িতে থাকলে উপোস করি, কিন্তু এখানে ঘুম ভাঙতেই প্রথম খাওয়ার কথা মনে এল! পাহাড়ে এই এক অভ্যেস - রাত্রে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড় আর সকালে রাক্ষুসে খিদে নিয়ে উঠে গান্ডেপিন্ডে গেলো! জোশীমঠে বাজার খোলে দেরিতে, তাই সাত-সকালে(ছ'টা) খাবারের চিন্তা না করাই ভালো মনে করে 'স্টক'-এর বিস্কুট নিয়ে বসলাম বারান্দায়! সামনে একটা খোলা মাঠ (গান্ধী ময়দান) - সেখানে কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলছে। ভোরের আলো ফুটলেও রোদ্দুর পাহাড়ের পাঁচিল টপকে এদিকে ঝাঁপাতে পারেনি তখনও! নবদুর্গা মন্দিরের মন্ত্রপাঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভালো লাগছে, বাড়িতে থাকতেও পাড়ার মণ্ডপের মন্ত্র এভাবেই কানে আসে - ভেবেই আরও ভালো লাগছে! কিন্তু মনটা গরম চায়ের টানেও কিছুটা ছটফটে! বেরিয়ে পড়লাম - জি এম ভি এন লজের পাশের সিঁড়ি দিয়ে বাসরাস্তায় নামতেই কাছাকাছির মধ্যে দু'তিনটে চায়ের স্টল নজরে এল। তারমধ্যেই রোদের সঙ্গে গলাগলি করা যাবে এমন একটা স্টলে গিয়ে দাঁড়ালাম! ধোঁয়া ওঠা গেলাস হাতে নিয়ে চেয়ে রইলাম পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠা নতুন আলোর স্থাপত্যে!

একপিঠ রোদ মেখে চায়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে ফিরলাম হোটেলে। বারান্দার রোদে কেউ বড়ি শুকোতে দিয়ে গেছে - মাকেও ডালের বড়ি দিতে দেখেছি, তবে এ বড়িগুলো কেমন অচেনা ঠেকল! ঘরে ঢুকে ব্যস্ত হলাম তৈরি হয়ে নিতে। গোছগাছ, দাড়ি কাটা, চান করা – সব সেরে উঠতে গেল আরও ঘন্টা খানেক। গামছা মেলতে বারান্দায় এসে দেখি এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা বড়ির জায়গাগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাখছেন। চোখাচোখি হতেই আলাপ করতে বসলাম - নমস্কার মাঈজি, ইয়ে আপ কিস চিজ সে বানায়ি? মাঈজি ইষৎ হেসে বলেন, "ইয়ে ক্ষিরা কি হ্যায় বেটা।" উম্ তাই, শসার বড়ি, খাওয়া তো দূরের কথা সাতজন্মের কল্পলোকেও যে ছিলনা তাকে চিনব কেমন করে! ধীরে ধীরে মাঈজির সঙ্গে গল্প জমল - মাঈজি-ই এ বাড়ীর কর্ত্রী, বছর পাঁচেক হল রিটায়ার করেছেন। ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে, দুই ছেলে - বড় আছে গুজরাটে – স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী, আর ছোটর দায়িত্বে ব্যবসা সাম্রাজ্য, - দুটো হোটেল ও একটা মিষ্টির দোকান। মাঈজিও খুঁটিয়ে জানতে চান আমি কী করি, ঘরে কে কে আছে, কোথায় গিয়েছিলাম, এখান থেকেই বা কোথায় যাব - এ সবই! কল্পেশ্বর যাব শুনে বলেন, "দশ-সাড়ে দশকে পহলে গাড়ি নেহি মিলেগা বেটা, আরামসে নাস্তা করকে থোড়া রেস্ট লেকে যাও।" সাড়ে আটটা নাগাদ বেরোলাম সকালের টিফিন সারতে - সেও মাঈজির বাতলে দেওয়া রেস্টুরেন্টে। গরম রুটি আর 'চানা ডাল' দিয়ে সকালের খিদের আঁচ নিভিয়ে ফেরার পথেই নজর পড়ল নধর সিঙ্গাপুরি কলায় - কিনে ফেল্লাম গোটা চার, এই একটা ব্যাপারে আমি এক্কেবারে হনুমান, পাকা কলা দেখলেই নোলা চাগাড় দিয়ে ওঠে!

পৌনে দশটা নাগাদ স্যাক পিঠে হোটেল ছাড়লাম, মাঈজির কাছে পেলাম ফের আসার আন্তরিক নিমন্ত্রণ সঙ্গে অমূল্য আশীর্বাদ! মিনিট দু-তিন হেঁটেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, খোঁজ নিয়ে নির্ধারিত জিপের মাথায় স্যাক চাপিয়ে জানলাম দশ জন সওয়ারির মধ্যে সবে অর্ধেক ভর্তি হয়েছে, অগত্যা অপেক্ষা! সময় এগোয়, - দশটা, সাড়ে দশটা, এগারটা - সওয়ারি সংখ্যা ওখানেই থমকে থাকে - সময় কাটে স্ট্যান্ডে পায়চারি করে। কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ি, তখনই দেবদূতের মত কপালে চাল-সিঁদুরের তিলক কাটা এক ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ভদ্রলোক সপার্ষদ, এসেই জিজ্ঞেস করেন, "কিতনা সওয়ারি হুয়া?" ওঁদের তিনজন নিয়ে সবে আট জানাতেই ড্রাইভারকে ডেকে বলেন, "ছোড়ো, বাকি দো কা কিরায়া ভি ম্যায় দে দেঙ্গে, গাড়ি ছোড়ো।" সবাই জিপে উঠলাম, - গাড়ি ছাড়ল। যাব হেলাং হয়ে উরগ্রাম পর্যন্ত - জোশীমঠ থেকে ১৪ কিমি পথ হেলাং, সেখানে কল্পগঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে আরও ১১ কিমি গেলে উরগ্রাম। তিলককাটা ভদ্রলোক বসেছেন সামনের সিটে জানলার ধার ধরে, রাস্তায় অনেকেই ওঁকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানাচ্ছেন, বুঝতে অসুবিধা হয়না উনি এ অঞ্চলে বেশ কেউকেটা গোছের! কথা বলে চলেছেন অনর্গল, সবই সরকারি কাজ-কর্ম সংক্রান্ত। আধঘন্টাতেই একটানা উৎরাইয়ে নেমে আসি হেলাং - ছোট্টো জায়গা, গুটি কয়েক দোকানপাট ও লজ, সোজা রাস্তা চলে গেছে চামোলির দিকে, আমরা নেমে যাই ডানদিকে বাঁক নেওয়া রাস্তায়। সামনেই কল্পগঙ্গার জীর্ণ সেতু, - পেরিয়ে উঠে আসি খানখন্দে ভরা শীর্ণ পথে। মধ্যে মধ্যে ছোটো ছোটো ধস, গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে হেলে-দুলে, ঝাঁপিয়ে-লাফিয়ে কোনোক্রমে এগিয়ে চলে আমাদের জিপ। মিনিট পনেরো এগিয়েই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যাম্বুল্যান্স চোখে পড়ে, অনুমান করি হয়তো রাস্তার ভয়াবহতার কথা মনে করেই আপৎকালীন এই ব্যবস্থা!

পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে গাড়ি চলছে – ওপরে উঠছি। উঠছি আর ভাবছি ভেদাভেদ করতে করতে মানুষ তবে ছাড়ল না স্বয়ং ঈশ্বরকেও! হরিদ্বার থেকে জোশীমঠের যে পথে এলাম - সে তো একেবারে ঝাঁ চকচকে পথ -'বদ্রী বিশাল'- এর পথ কিনা! অথচ সেই জোশীমঠেরই মাত্র ২৮ কিমি দুরত্বে পঞ্চম কেদার কেমন অবহেলায় পড়ে! হঠাৎ সামনে থেকে একটা জিপ নেমে আসতে দেখে মনের ধন্দটা একটু হলেও কাটল, - যাক তাহলে এই রাস্তায় গাড়ি 'চলাচল' করে! আরও মিনিট দু-তিন চলে একটা বাঁকের মুখে পৌঁছতেই হৈ হৈ করে একদল মানুষ ছুটে এসে আমাদের পথ আটকান, - ড্রাইভার সাহেব ও তিলক কাটা ভদ্রলোক ওঁদের সাথে নিজেদের ভাষায় কথা বলেন, বারকয়েক আমার দিকে তাকিয়ে কেমন ইতস্তত করেন! – জানতে চাই, কি ব্যাপার ? যা শুনি তাতে বুঝতে পারি ২০১৫ সালে পৌঁছেও পাহাড় আছে পাহাড়েই! – একজন সন্তানসম্ভবা মহিলা প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে আছেন রাস্তার ধারে আর তাঁর পরিবারের লোকজন পাগলের মত ছোটাছুটি করছেন কোনো গাড়ি যদি তাঁদের একটু পৌঁছে দেয় অ্যাম্বুল্যান্সের কাছে - সেই অ্যাম্বুল্যান্স - উঠে আসার পথে যাকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি! –রাস্তার বেহাল অবস্থায় তার পক্ষে আর উঠে আসা সম্ভব হয়নি! ওঁরা আমায় জিজ্ঞেস করেন গাড়িটি ছেড়ে দিতে রাজি কিনা! হিমালয়ে আসি পথ চলতেই, শুধু যে পথে যান চলে সেখানেও পথ চলায় মনের সায় থাকেনা, তাই গাড়ি চাপা! আর এমন পরিস্থিতিতেও কারো সাহায্যে আসবনা এটা ভাবতেই যে কষ্ট হবে - ওঁদের বলি সে'কথা। সবাই তাড়াতাড়ি নেমে ওঁদের দ্রুত এগিয়ে দিই! ড্রাইভার সাহেব যাওয়ার আগে বলে যান, "আধাঘন্টা

রুকিয়ে দাদা, ম্যায় ছোড় কর-ই আ রাহা হুঁ"। মনে পড়ছিল প্রায় সতের বছর আগে রূপকুণ্ড থেকে ফেরার কথা। সেবার ওয়ান গ্রামের একটি বাচ্চা মেয়েকে ৩২ কিমি পায়ে হেঁটে ডাক্তার দেখাতে যেতে দেখেছি তার দাদুর সঙ্গে! অসহ্য পেটে যন্ত্রণা নিয়েও তাকে চলতে হয়েছিল অতটা পথ! হাজারো হাসি-মজা করেও আমরা থামাতে পারিনি তার দু'চোখের জলের ধারা! আমরা সমতলের লোকেরা এরপরেও প্রশ্ন তুলি "পাহাড় কেন অশান্ত হয়?"

পাহাড়ের যে বাঁকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা বেশ গাছগাছালিতে ছাওয়া, একেবারে 'শ্যামলে শ্যামল' - চারদিকে ঝুপঝুপে ছায়া, কেমন যেন বিষন্নতায় ছোপানো ক্যানভাস! ভাবছিলাম রাস্তায় কাতর ওই ভারতজননী কি শুধুই সভ্যতার বৈষম্যের ফল নাকি অসভ্যতার উন্নয়নেরও জীবন্ত চিত্রায়ণ! "কল্পেশ্বর যায়েঙ্গে?" সম্বিত ফেরে, দেখি প্রশ্নকর্তা সেই তিলককাটা ভদ্রলোক! 'হ্যাঁ' বলি। আরও একগুচ্ছ প্রশ্ন ধেয়ে আসে - কোথা থেকে আসছি? একা কেন? এসবই আমার কাছে 'কমন' প্রশ্নমালা, তাই ঝটপট উত্তরও দিয়ে দিই। এবার আমারও কিছু জেনে নেওয়ার পালা। জিজ্ঞেস করি - আপনি কি সরকারি কোনও কাজে এদিকে এসেছেন? বেশ সগর্ব উত্তর পাই, -"ম্যায় উরগ্রাম কী পঞ্চায়েত প্রধান হুঁ।" শুনেই আমার কেমন চোয়ালটা শক্ত হয়ে যায়! ওঁকে বলি, আপনার মনে কখনও এ প্রশ্ন আসেনা যে আপনি আছেন কেন! ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান। খোলসা করতে বলি - আপনার অঞ্চলের কাউকে রাস্তায় ভূমিষ্ঠ হতে দেখলে আপনার লজ্জাবোধ হয় না? মাত্র প্রথমবার এই পথে আসতে আমারই যদি বিরক্তি বোধ হয় তাহলে এপথ যাদের নিত্য, তাঁদের কষ্ট লাঘবের জন্য প্রধান হিসেবে আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন? ভদ্রলোক একটু লজ্জিতই হন, ব্যক্ত করেন নিজের অসহায়তা! বিরোধীদলের প্রতিনিধি হওয়ায় তাঁকে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, - দেন সে ফিরিস্তিও! তবে আশার বাণীও শোনান, আগামী তিনমাসের মধ্যেই নাকি এই রাস্তা 'সারাই' হয়ে যাবে! - কথার মাঝেই আমাদের জিপ এসে যায়, উঠে পড়ে রওনা দিই। মিনিট দশ উঠেই পাহাড়ের যে ঢালে গাড়ি দাঁড়াল তার নাম 'লিয়ারি' - গোড়ালিডোবা ধুলোয় মোড়া প্রান্তর, ইতিউতি খান তিন-চার অস্থায়ী খাবারের দোকান, - ব্যস, এখানেই জিপযাত্রার ইতি!

লিয়ারি থেকে দেবগ্রাম তিন কিমি। কাঁচা মেঠো পথ ধরে উঠে চলি সেই পথে, সঙ্গী সপার্ষদ হরিশ পানওয়ার, পঞ্চায়েত প্রধান, উরগ্রাম। গল্প করতে করতে মিনিট পাঁচ উঠেই দেখা মেলে 'উরগ্রাম ভ্যালি'র, তিন দিক উঁচু সবুজে ঘেরা রঙবাহারি উরগ্রাম-দেবগ্রাম, উপরের অনন্ত নীল নীলিমা যেন আলিঙ্গনে ডাকে এই বর্ণোজ্জ্বল ধরিত্রীখণ্ডকে! রবি ঠাকুর মনে পড়ে, -"অসীম সে চাহে সীমার নীবিড় সঙ্গ / সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা"। একটু এগিয়েই বাঁদিকে পথ চলে গেছে উরগ্রামের দিকে, সোজা পথে দেবগ্রাম। হরিশবাবু উরগ্রাম যাবেন, তাই বিদায় নেবার আগে আমার দু'হাত নিজের দু'হাতে নিয়ে শুভেচ্ছা জানান, জানাতে ভোলেন না আবার আসার নিমন্ত্রণও! রাস্তার ক্ষোভ রাস্তাতেই পড়ে থাকে, এগিয়ে চলি!

এদিকের রাস্তা সরু, তবে কংক্রিটের, দু-দিকে ক্ষেত - কোথাও রামদানার লাল টুকটুকে ঝুঁটি তো কোথাও পাকা রাজমার হলুদসোনা চেন। মধ্যে মধ্যে কয়েক ঘর বসতি, সেখানে নতুন অতিথিকে মেপে নেওয়ার উঁকিঝুঁকি। কোথাও লোমশ রামছাগলের গম্ভীর দৃষ্টি তো কোথাও রাশভারী মোরগের তীক্ষ্ম চাউনি, বাদ যায়না ভল্লুক সদৃশ সারমেয়রাও! শুধু লোকজন চোখে পড়েনা! মিনিট পঁয়ত্রিশ এঁকেবেঁকে পথ চলে পৌঁছাই দেবগ্রাম - দেবরাজ ইন্দ্রের কল্পতরুপ্রাপ্তির গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখেই রাস্তার ডানদিকে পাথরে তৈরি একটা ছোট মন্দির - নব্য মনে হয়! আরও কয়েক পা এগোলেই বাঁদিকে 'পথিক গেস্ট হাউস' - ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা তিন ভাষাতেই দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে লেখা। ইন্টারনেটে এই গেস্টহাউসের কথাই লেখা আছে, তবে হোটেলের পরিচালক রাজেন্দ্র সিং নেগির যে ফোন নং দেওয়া আছে তাতে গত দু'দিন বহু চেষ্টা করেও কোনোও যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। উঁহু, একেবারে যে সত্যি বললাম তা নয়, গতরাতে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা ফোন ধরে এমন গালাগাল করলেন যে আমার ধাতস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় গেল! যাক্ সে কথা, পথিকের কথা ভেবেই যে পথিক গেস্ট হাউস, স্থাননির্বাচনে অন্তত তার সুন্দর প্রকাশ রেখেছেন নেগি সাহেব। বোঁচকাকাঁধে পাহাড়ি পথ চলে গ্রামে ঢুকেই যদি থাকার জায়গা পাওয়া যায় তাহলে আমার মত পথচলতি মানুষ এমনিতেই খুশীতে ডগমগ হয়ে থাকে। একে এসেছি একা, তার ওপর রাস্তাতেও কোনও ট্যুরিস্ট চোখে পড়েনি, ধরেই নিয়েছি জায়গা পাওয়া যাবে, প্রায় ধেইধেই করে ঢুকে পড়লাম গেস্ট হাউসের উঠোনে। ওঃ বাবা, এতো রীতিমত কলরব! তাও কিনা বাংলা চোখা চোখা শব্দ উচ্চারণে! বেশ হই হই রবে রাত্রের পানপর্বের ব্র্যান্ড নিয়ে আলোচনা চলছে! সঙ্গে সঙ্গে মন পিছলে গেল কয়েকদিন পিছনে, কুঁয়ারি পাস ঘুরে এসে তাঁবু ফেলেছি খুল্লারায়, সারাটাদিন ওখানেই শুয়ে-বসে কাটানো, দুপুরের খাবার খেয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরছি, সঙ্গী সহযোগী রাকেশ। মাঝেমাঝেই বড় বড় পাথরের আড়ালে মাতালকরা হুল্লোড়ের শরীরী অবশেষটুকু নজরে আসছে! আর প্রতিবারই রাকেশ বলে উঠছে - "ইয়ে সব্ বাঙালি লোগোঁ কি হ্যায়।" একসময় বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিলাম, - তু ক্যায়া উসকে সাথ থা? উত্তরে ও বলেছিল - "নেহি সাব ইয়ে ব্র্যান্ড সির্ফ বাঙ্গালি লোগোঁনে হি পিতে হ্যায় ।" প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর ধরে হিমালয়ের দূর্গম পথে পা ফেলতে ফিরে ফিরে আসি, - এ এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন! - একই জল-হাওয়ায়, একই পরিবেশে বড় হওয়া আমাদের ছেলেমেয়েরা এত বদলে গেল কিভাবে বুঝে উঠতে পারিনা কিছুতেই, - এও এক অক্ষমতা! হঠাৎ

সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল একটি তরুণী। আমাকে দেখেই কেমন থমকে দাঁড়িয়ে গেল, - তারপর জিজ্ঞেস করল, - "রুম লেনা হ্যায়?", - হ্যাঁ বলতেই বলল, - 'বাঙালি?' আবার বললাম, হ্যাঁ। - আমার বাঁদিকে চোখের ইশারায় একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বলল, "ওখানে কথা বলুন, - দেখুন পান কিনা!" আমার যাওয়ার আগেই 'কৌওওন আয়া' বলে এক মহিলা ওই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, - সামনেই আধবুড়ো গুঁফো লোকটির দিকে আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে জানতে চান, -"বুকিং হ্যায় ক্যায়া?", মাথা নেড়ে জানাই – না। "ফির্ তো রুম নেহি মিলেগা" – শুনে একটু খুশি-ই হলাম - পাহাড়ের নির্জনতায় বঙ্গীয় হট্টগোলে এখন আর কোনোভাবেই অংশীদার হতে ইচ্ছে করেনা, তাই অন্য ডেরার খোঁজে ফের পা বাড়ালাম। মিনিট তিন-চার এগিয়েই রাস্তার ডানদিকে চোখে পড়ল রঙচঙে 'কল্প প্যালেস' লেখা একটা বাড়ি। খেয়াল পড়ল,- হেলাং-এ রাস্তার ধারে এর একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। বাড়ির ছাদে এক মহিলা কিছু রোদে দিচ্ছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করি, রুম মিলেগা দিদি? "হাঁ হাঁ, অন্দর আইয়ে" – আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে ঢুকি। ঘর দেখে কল্প প্যালেসেই সেদিনের রাত্রিবাস স্থির করি।

মালপত্র ঘরে রেখে দুপুরের খাবারের ফরমায়েশ করে ক্যামেরা গলায় ছাদে উঠে এলাম। পাহাড়ের সবুজ বেয়ে শরতের চিকচিকে রোদ তখন গড়িয়ে নেমেছে দেবগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠেঘাঠে। সোনাঝলমল প্রকৃতির সেই রম্যবেশে হারিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ! "কি দাদা মন্দির দর্শনে যাবেন না?" – ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, রাস্তায় দাঁড়ানো তিনজন যুবক আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন উত্তরের অপেক্ষায়। বলি, - যাব, তবে দুপুরের খাবার খেয়ে, তাই আরও কিছুটা দেরী হবে। 'সে কি!', প্রায় আঁতকে উঠল ওরা, বলল - "খেয়ে তো চলতে কষ্ট হবে দাদা, তার চেয়ে ঘুরে এসে খাবেন।" হেসেই বললাম, না না, আপনারা এগোন, হয়তো ফিরতি পথে আমাদের দেখা হবে! আসলে মন্দির এখান থেকে মাত্র আধঘন্টার পথ, তাই এদিকের সব কাজ সেরে একেবারে সমস্ত সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে মনে করেই খেয়ে বেরোনো ঠিক করেছি। হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি তাড়িয়ে নীচে নামাল। টেবিলে তখন অপেক্ষা করছে গরম ভাত, কড়িহ্ আর কুমড়ো শাক, - তৃপ্তি করে খাবার খেয়ে বেরোলাম মন্দির দর্শনে, - জয় কল্পেশ্বর! বাঁধানো রাস্তা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গেছে দেবতার দ্বারে। - চড়াই খুবই অল্প, তাই হাঁসফাঁস না করে স্বচ্ছন্দেই পথ চলা যায়। ছবির মত প্রাচুর্যে ভরা গ্রাম - ক্ষেতভরা শস্য, ফলভরা গাছ, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য যেন আত্মগোপন করে আছে এই গ্রামে – দেবগ্রাম। মুগ্ধ আমি হাঁটছি কম, দেখছি বেশি। বেশিক্ষণ অবশ্য অমন চলল না - কোথা থেকে মুঠো মুঠো ছাইকালো মেঘ এসে ছেয়ে দিল আসমানি নীলকে! ওপরের গুরুগুরু রব বুকেও আওয়াজ তুলল – সে অবশ্য নিছক-ই ছবিযন্ত্রের মায়ায়! - পড়িমরি হাঁটা দিলাম একটুকরো ছাউনির খোঁজে। পথের এক বাঁকে হারিয়ে গেল দেবগ্রাম - এদিকটা যেন বড় বড় গাছেদের নির্ভেজাল আড্ডাখানা, - হাওয়ার বেগে তাদের স্বরও জোর পেয়েছে, মসমস্ পায়ে এগিয়ে চলি ওদের ছুঁয়েই!

একটু গিয়েই স্পষ্ট হল ডানদিকের সরু খাতে বয়ে চলা কল্পগঙ্গা - স্পষ্ট হল নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে কল্পেশ্বরের তোরণ-ও! এক-দু মিনিট হেঁটেই দাঁড়ালাম এক বিশাল ধ্বসের মুখে। না, ধ্বস্ পেরোতে হবেনা, এখান থেকে নামতে হবে সোজা নদীগর্ভে, সেখানে সেতু ভেঙে যাওয়ায় কাঠের পাটা ফেলে হয়েছে যাতায়াতের আপৎকালীন ব্যাবস্থা! দেখা পেলাম সেই তিন যুবকের, ওঁরা তখন নদী পেরিয়ে এমুখো। অপেক্ষা করলাম ওঁদের উঠে আসার। উঠে আসতেই গতানুগতিক আলাপ - কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন? বাড়ি কোথায়? – আমি দুর্গাপুরের, ওঁদের জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'কলকাতা', সেখানে কোথায় জিজ্ঞেস করে জানলাম, 'কাঁচড়াপাড়া!' বাঙালির এ এক অদ্ভুত রোগ! কল্যাণী থেকে কাকদ্বীপ সব কলকাতা! ভারতের অন্য কোন প্রদেশের মানুষকে এমনটা করতে দেখিনা, ভাগলপুরের লোক যেমন পাটনায় থাকেননা বলে লজ্জা পাননা, তেমনই বেনারস-এর লোকও মুক্ত কণ্ঠে বলেন তাঁর শহরের নাম! তবে আমাদের কিসের এত হীনমন্যতা? - উত্তর অজানা! 'পরে দেখা হবে বলে' ওঁদের বিদায় জানিয়ে এগোলাম মন্দির পথে। নদী পেরিয়ে ভাঙাচোরা পাথরে সাজানো সরু পাহাড়ি পথে খানিক উঠেই মহাদেবের মন্দির - ঢুকতেই ডানদিকে পূজারীর বাসগৃহ - লাগোয়া তোরণের মাথায় সিঁদুরলেপা হনুমান মূর্তি, আরও কিছুটা এগোলে পুরনো কিছু নন্দী মূর্তি, ত্রিশূল ও একখানি রঙচঙে তোরণ - তার খিলানে ঝোলানো ঘন্টা, তোরণ পেরিয়েই ডানদিকের প্রায়ান্ধকার গুহায় কল্পেশ্বর শিলাখণ্ড। দর্শন সেরে পূজারীকে দক্ষিণা দিয়ে আর মায়ের জন্য পুজোর ফুল নিয়ে বাইরে এসে বসলাম সাধুদের আখড়ায়। বেশ বৃষ্টি পড়ছে, ঠান্ডায় জড়োসড়ো হয়ে বসলাম উনুনের আঁচের সামনে। না চাইতেই জুটে গেল এক গেলাস গরম চা, - ভেতো বাঙালির আড্ডা জমল দেবভূমে! ওখানেই আলাপ হল ইয়ান-এর সঙ্গে। বৃষ্টি একটু ধরতেই সাঙ্গ হল সাধুসঙ্গ - ধোঁয়াওঠা মেঘের গলায় মুখ ডুবিয়ে হুড়মুড়িয়ে পা চালালাম। উড়ে যাওয়া মেঘের মতই 'উড়তামনন' পৌঁছে দিল গন্তব্যে। তখনও পশ্চিমী মেঘের জালে উঁকি দিচ্ছে কমলারঙা সুয্যিমামা। ভিজে আলোর ওড়না ধরে ফের বেরোলাম গ্রাম ঘুরতে।

ইচ্ছে ছিল এখান থেকেই বংশীনারায়ণ-ডুমক্ হয়ে চলে যাব রুদ্রনাথ-এ, কিন্তু এ যাত্রায় তা আর হল কই! কাল থেকেই শুরু হচ্ছে এখানের বিয়ের মরশুম - তাই কেউই সঙ্গী হতে রাজি নয়, সাধুরা কেউ ওপথে যাবেন কিনা - খোঁজ নিয়েছি তারও! সেখানেও শুধুই 'না!' হঠাৎ করেই পাহাড় জুড়ে বাদল মেঘের ডানায় চেপে সন্ধ্যে নামে - ডেরায় ফিরি। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামে, একান্তে করিডরে চোয়াল চেপে বসে থাকি - চারদিকে

অন্ধ-আলো - মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের কাঁপা হাতে ধরা পড়ে পাহাড়ের ফালাফালা রূপ! সন্ধে তখন সাতটা - ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে টর্চ জ্বালিয়ে। কাছে আসতেই বুঝতে পারি 'ইয়ান!' ঠান্ডায় জুবুথুবু, আমাকে দেখে জানতে চায়, এ হোটেলেই উঠেছি কিনা? ভরসা পেয়ে রুম নেয় আমার পাশেই। 'পাওয়ার' নেই, পাশাপাশি চেয়ার টেনে বসি এসে খোলা বারান্দায় - বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝাঁপায় - আমাদের গল্প জমে!

কতরকম প্রশ্ন আসে! - আমি ব্রাহ্মণ কিনা? তাহলে সবার হাতে খাই কি করে? অবিবাহিত জেনেও প্রশ্ন করে, ছেলে-মেয়ে ক'টি? বেশ রাগত স্বরেই বলে উঠি - বিয়ে ছাড়াও সন্তানের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? ও কিন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলে, "আমাদের দেশে তো এমনটা হয়েই থাকে!" বলি, ওই জন্যই তো তুমি-আমি আলাদা দেশের লোক! ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, বলে - "আমিও বিশ্বাস করি তোমার দেশের ব্যবস্থাটাই ভাল!" খুব অবাক হয় বাড়িতে শুধু মা আর আমি থাকি শুনে! দুঃখ করে বলে - "আমি বিয়ে করার পরে মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি, আর দ্যাখো আজ দশ বছর হল আমার ডিভোর্স হওয়ার পরে আমার স্ত্রীও কোনোদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি!" বেশ লেগেছিল বৃষ্টিভেজা রাতের সেই সাহেবকে! ইয়ান ব্রিটিশ, বয়স ৭৬, কাজ করতেন 'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ'-এ, - তাই বছরে দুটো 'এয়ারট্যুর'-এ ৫০% ডিসকাউন্ট পান। বেশ কয়েকবারই এসেছেন এ'দেশে। অনেক খারাপের মধ্যেও কোথাও একটা ভালোবাসা জন্মেছে আমার দেশটার প্রতি! চোখ বড়বড় করে বলে - "তোমাদের মধ্যে ডিসিপ্লিনের ছিঁটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই, কেউ কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করে না, - অথচ অবাক হয়ে দেখি এতবড় দেশটা মোটামুটি ঠিকঠাক-ই চলছে!" শুনে বেশ মজা পাই! ইয়ানের এটা ষষ্ঠ ভারত সফর, পাহাড়ে ওর প্রিয় জায়গা কৌশানি, আর এদেশে ওর প্রিয় শহর মুম্বাই! কাল এখান থেকে ও কৌশানিই যাবে, তারপর মুম্বাই হয়ে দেশে ফেরা। এখানে ও এসেছিল 'ইঞ্জিনিয়র বাবা' নামে এক সাধুর সাথে দেখা করতে। খুব বিস্মিত হয়ে বলে - "জানো, তোমার দেশের একটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগে!" আমিও বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করি - কি ইয়ান ? বলে - "মুম্বাইয়ের বস্তিতে আমি দেখেছি একই পরিবারের আত্মীয়দের মধ্যে কী তুমুল ঝগড়া, পারলে একে অন্যকে মেরেই ফেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা একে অপরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেনা, বছরের পর বছর একই সঙ্গে থাকছে! এরপরই ধরা গলায় বলতে শুনি, "আমার চার ছেলে, প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত, অথচ গত পনের বছরে ওরা কেউ একদিনের জন্যও আমার একটা খবর নেয়নি!" মনে মনে বলি, সাহেব এ দেশের ছবিটাও যে অতটা স্পষ্ট নয়! হয়তো বেঁচে থাকার পরিসর যেখানে সংকীর্ণ - হৃদয়ের প্রসারতা সেখানে কিছু বেশিই! নয়তো 'বস্তি'র ছবি 'বসতি'তে এসে অমন পাল্টে যায় কী করে!

পরদিন সকাল হয় ঝকঝকে নীলের মাঝে - হোটেলের দিদির কাছে আখরোটের ছাঁদা নিয়ে আটটাতেই ছেড়ে আসি নেয়ে ওঠা দেবগ্রাম - সঙ্গী ইয়ান। মিনিট দশ হেঁটেই ইয়ান ক্লান্ত বোধ করে - স্যাক কাঁধে হাঁফ ধরছে। ওর স্যাক আমাকে দিতে বলি, কুণ্ঠা বোধ করে, বলে - "না না, আমার ব্যাগ আমাকেই বইতে দাও!" ইয়ান আমার পিতৃস্থানীয় - সেটাই ওকে স্মরণ করাই! বলি - আজ তোমার জায়গায় আমার বাবা থাকলে কি তাঁকেও ওই স্যাক বইতে দিতাম? তুমিও তো আমার বাবার বয়সী, আর এটাই আমার দেশের রীতি! ওর দু'চোখ চিকচিক করে ওঠে! লিয়ারি থেকে জিপে ফিরে ইয়ান নেমে যায় হেলাং-এ, দু'হাতে জড়িয়ে বলে,-"আবার দেখা হবে বন্ধু!" জিপ ছেড়ে দেয়, আমি ধরি জোশীমঠের পথ। মন গুনগুন করে - "তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর / সবায়ে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ দেখা যেন সদা পাই।।"

~ কল্পেশ্বরের আরও ছবি ~

‘হরফ’ নামে একটি প্রিপ্রেস ইউনিট চালান সুমন্ত মিশ্র। হিমালয়ের আতিথ্য গ্রহণ ও ফুটবল খেলার দৃষ্টিসুখ তাঁকে অসীম তৃপ্তি দেয়। ভালোবাসেন রবিঠাকুরের গান শুনতে, প্রবন্ধ পড়তে, ছোটগাছকে বড় করতে, বেড়াতে আর নানারকমের মানুষের সাহচর্য পেতে। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় ‘আমাদের ছুটি’ কিছু সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে মেলমেশার সুযোগ করে দেওয়ায় আনন্দিত।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

সপ্তমন্দিরের দেশে

দেবতোষ ভট্টাচার্য্য

~ মহাবলীপুরমের আরও ছবি ~

"সব্বোনাশ! এই গরমে!!"
বলেই সোফায় ধপ করে বসে পড়লেন চ্যাটার্জীদা। জানতুম এই সময় খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে - কারণ চ্যাটার্জীদা ছাড়া ঘুরতে যাওয়ার মজাটাই মাটি। প্ল্যান হচ্ছিল এপ্রিলের শেষে মহাবলীপুরম যাওয়া নিয়ে, কলকাতায় ওঁর বাড়িতে বসেই। কিন্তু এই গরমে ওখানে যাওয়ার কথায় একেবারে বেঁকে বসেছেন তিনি। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছেনা দেখে ছুঁড়লুম ব্রহ্মাস্ত্র - "গরমে কলকাতার চেয়ে মহাবলীপুরম অনেক ভাল, এখন ভেবে দেখুন বসে বসে সেদ্ধ হবেন কিনা!"
ব্যাঙ্গালোর থেকে মহাবলীপুরম যাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হল চেন্নাই গিয়ে সেখান থেকে টানা গাড়ি - তা মোটামুটি আড়াইঘন্টা মত লাগে। আমরা ডবল ডেকার ট্রেনেই যাওয়া ঠিক করলুম, কারণ এই ট্রেনটার কথা আগে অনেক শুনলেও চড়ার সুযোগ হয়নি। ও হ্যাঁ, চ্যাটার্জীদারও একটা টিকিট কাটা হয়েছিল। গাড়ির দুলুনিতে একটু ঢুলুনি মত এসেছে, হঠাৎ তিনি খোঁচা মেরে উঠলেন - "যাচ্ছো তো! মহাবলীপুরমের ইতিহাস কিছু জানা আছে কি?" ঘাড় নেড়ে জানি না বলতেই খুব উৎসাহের সঙ্গে আমায় বোঝাতে শুরু করলেন।
"মহাবলীপুরম জায়গাটা বেশ প্রাচীন হে! আর তেমনি বড়ই রহস্যময়। একসময় খুবই ব্যস্ত বন্দর ছিল এ শহর - সেই টলেমির যুগে এখান থেকে ভারতীয়রা বাণিজ্য করতে যেত সুদূর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। মহাবলীপুরমের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এমন অনেক জিনিস উদ্ধার করেছেন যার বয়স প্রায় দু হাজার বছর - মানে হল গিয়ে খ্রীষ্টাব্দের একদম শুরুর দিক। কেউ কেউ অবশ্য সন্দেহ করেন যে এটি আসলে আরও প্রাচীন। চতুর্থ শতকের চিনা বা রোমান মুদ্রা থেকে এটা পরিষ্কার, পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন ভারতীয় বণিকরা। দুঃখের কী জানো, অনেক মুল্যবান জিনিস সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পল্লব রাজাদের সময়, মানে ধরো মোটামুটি তৃতীয় থেকে নবম শতক, মহাবলীপুরম একটি শিল্প সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে সপ্তম শতকের দুই পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ ও তাঁর পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মণের নাম করতেই হয়। মূলতঃ এই অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তিগুলি মহারাজ নরসিংহবর্মণের সময়ই তৈরি।
তবে এই জায়গার নাম কেন মহাবলীপুরম হল তা নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। সবচেয়ে প্রচলিত হল - মহা বলবান রাজা বলী, যিনি প্রহ্লাদের প্রপৌত্র ছিলেন, তাঁর নামেই মহাবলীপুরম। মানে এককথায় এ হল মহাবলীর দেশ।" দিব্যি লাগছিল শুনতে। এই বিশাল ভারতবর্ষের ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনই রোমাঞ্চকর।
প্রায় রাত দশটায় ট্রেন পৌঁছল চেন্নাই। গাড়ি ছুটল চেন্নাই মেরিনা বিচ পেরিয়ে ইষ্টকোস্ট রোড ধরে। মহাবলীপুরমের হোটেল মহাবস-এ যখন পৌঁছলাম তখন আর শরীরে বিশেষ শক্তি ছিল না। ডিনার রেডি করে রাখাই ছিল - খেয়েদেয়ে সোজা বিছানায়। সেই ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় দেখা ছবিগুলো যে কালকে জীবন্ত হয়ে উঠবে, এই ভেবেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল।
ঐতিহাসিক শহরগুলির যেটা সমস্যা, জনসংখ্যার চাপে ঘিঞ্জি এক শহরে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে তার আকর্ষণটি হারিয়ে ফেলে। সভ্যতার শুরুর দিকের অমূল্য জিনিসগুলোর প্রকৃত মর্যাদা সবাই ঠিক দিতে পারে না। তাই বহু জিনিস হয় হারিয়ে যায় বা অনাদরে নষ্ট হয়ে যায়। এখানে অবশ্য আধুনিক ও প্রাচীন ভারতের এক অদ্ভুত সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেল।

গরম সেদিন বেশ ভালই ছিল বলতে হবে। কিন্তু সমুদ্রের হু হু হাওয়ায় কষ্ট তেমন হচ্ছিল না। তবু সকাল সকালই পঞ্চরথ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হল। প্রথমেই বলে রাখি, এটি পল্লবদের আরও বহু স্থাপত্যকীর্তির মত অসমাপ্ত। প্রধান বিশেষত্ব হল - একটাই পাহাড়ের ন্যায় বিশাল পাথর ওপর থেকে কেটে কেটে এই পাঁচটি মন্দির বানানো, পাঁচটি পাথর নয়। কিন্তু দেখে তা বোঝার যো নেই। শুধু প্রথমটিতেই বিগ্রহের দেখা মেলে - দেবী পার্বতী। এর অনেকটা অংশ সময়ের দাবীতে মাটির নিচে চলে যায়, যা পরে খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছিল। মন্দিরের চূড়াগুলি অবিকল বৌদ্ধস্তুপের মত। এমনকি পাথরের সিংহের মুখগুলিতে চৈনিক সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। তাই পল্লবদের অন্যান্য কীর্তির চেয়ে এটি একটু অন্যরকমই লাগে।

পঞ্চরথ

মন্দিরগুলি অসমাপ্ত হলেও দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। সত্যি বলতে কী হাজার বছর আগে ভারতীয় কারিগরদের এই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে চোখে ঘোর লেগে যায় যেন। একটি প্রমাণ সাইজের পাথরের হাতি রয়েছে যা এত স্বাভাবিক যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আরকিওলজিকাল সোসাইটি মন্দিরগুলি পঞ্চপাণ্ডবের নামে নামকরণ করেছে। প্রথমটিতে নারীমূর্তি রয়েছে বলে সেটি দ্রৌপদীর নামে। এছাড়া

আছে ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব। এখানে বলে রাখা ভাল, পাণ্ডবদের সঙ্গে এগুলির কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই - নিছকই নামকরণ মাত্র। গাইডের কথানুযায়ী, এগুলিতে বিগ্রহ বসিয়ে যাতে পূজার্চনা না শুরু হয়, এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই যাতে এখানে প্রবেশ করতে পারে - সেটিই ছিল নাকি মুখ্য উদ্দেশ্য। এতক্ষণে তপ্ত বালিতে যেন পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে শুরু করেছে। ফিরে আসার সময় শোনা গেল, এখনও নাকি মাঝেমধ্যেই খোঁড়াখুঁড়ি চলে। কারণ বিশ্বাস, নিচে আরও অনেক আশ্চর্য লুকিয়ে আছে। থাক না হয় সেসব আমাদের পরের প্রজন্মের জন্য।

পঞ্চরথের খুব কাছেই রয়েছে ইন্ডিয়ান সী শেল মিউজিয়াম - এটি নাকি এশিয়ার বৃহত্তম সী শেল মিউজিয়াম। অন্তত চল্লিশ হাজার বিভিন্ন আকৃতি ও প্রজাতির শামুক, ঝিনুক ও সামুদ্রিক প্রাণীর দেখা মেলে এখানে। সত্যি বলতে কী, প্রকৃতি যেন দুহাতে মুঠো মুঠো রঙ নিয়ে রাঙিয়েছে তার বড় আদরের প্রাণীকুলকে! আমায় বেশ অবাক করেছে অপূর্ব রামধনুরঙা শামুকগুলো। আর কোণায় রাখা কারুকাজকরা বিশাল শাঁখটি যেন সেই মহাভারতের যুগের পাঞ্চজন্য - কৃষ্ণের হাতেই সে শোভা পায়। এখানে ঝিনুকের পেটের মধ্যে আসল মুক্তো দেখার সৌভাগ্য হল। কয়েকটার আকৃতি তো বেশ বড়।

মিউজিয়ামের দেওয়ালের লেখা দেখা জানা যায় যে এটি রাজা মহম্মদ নামে এক ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে বহু দেশে বিদেশ ঘুরে তিনি এসব সংগ্রহ করেছেন, এবং দান করে গেছেন এই মিউজিয়ামকে। সমুদ্র ও তার সম্পদকে কতখানি ভালবাসলে যে তা করা সম্ভব!

এখান থেকে খানিকটা এগোলে দূর থেকেই চোখে পড়বে লাইটহাউস। মানে নতুন লাইটহাউস। পুরনোটি বহু বছর আগেই পরিত্যক্ত, সেটি মহিষাসুরমর্দিনী গুহার কাছে। যাই হোক টিকিট কেটে চড়া হল ওপরে। শেষ ক'ধাপ সিঁড়ি কিন্তু বেশ সরু ও বিপজ্জনক। একসাথে ওপর নিচ করা একেবারেই অসম্ভব - একদল ওপরে উঠে গেলে তবেই ওপরের দল নিচে নামতে পারে। সমুদ্র এখন বেশ দূরে সরে গিয়েছে বোঝা যায়। ওপরে হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া বইছিল, একবার উঠলে আর নামতে ইচ্ছে করে না।

হোটেল মহাবস-এর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই বলতে হবে। ডিনার টেবিলে চ্যাটার্জীদার ভাবভঙ্গি খুব একটা সুবিধার ঠেকছিল না। এক টুকরো রুটি কায়দা করে পাকিয়ে মুখে পুরে জিজ্ঞেস করলেন - "ল্যান্ড অফ সেভেন প্যাগোডাস" মানে কি বল দেখি? ঠোঁট উলটে বললুম - জানি নে। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বোঝাতে শুরু করলেন চ্যাটার্জীদা।

"এখন সমুদ্রের ধারে যেখানে শোর টেম্পল দেখা যায়, সেখানেই আগে নাকি ছিল সাত সাতটা মন্দির। বহু প্রাচীন কাল থেকেই, অন্তত মার্কো পোলোর সময় তো বটেই, ভিনদেশী নাবিকরা এই জায়গাকে চিনতেন সপ্ত মন্দিরের দেশ বলে। বর্তমানে ওই একটি মন্দিরই টিকে আছে। সম্ভবতঃ বাকি সব তলিয়ে গেছে সমুদ্রে। ২০০২ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফি এবং বিলেতের সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে সমুদ্র গর্ভে অভিযান চালায়। বোঝা যায় এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যা একসময় শিল্প স্থাপত্যে ভারতের গর্ব ছিল - তা হারিয়ে গেছে সমুদ্র গর্ভে!

যেটুকু জানা যায়, পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ সপ্তম-অষ্টম শতক নাগাদ এর নির্মাণ করেন। বাকীটা চলো কাল নিজের চোখেই দেখবেখন।"

আমাদের হোটেল থেকে সমুদ্র একেবারেই হাঁটাপথ। চারিদিক দেখতে দেখতে হাঁটতে মন্দ লাগছিল না, বেশ দূর থেকেই চোখে পড়ল মন্দিরের চূড়ো। মন্দিরটি একেবারেই সাগরের কিনারে। সমুদ্রের আগ্রাসন ঠেকাতে প্রচুর বোল্ডার ফেলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই এটি একটি অসাধারণ শিল্পকীর্তি। মন্দিরটির চারিদিক ঘেরা অসংখ্য ষাঁড়ের মূর্তি দিয়ে - যা থেকে সহজেই ধারণা করা যায় এটি দেবাদিদেবের আরাধনার স্থান। মন্দিরের চূড়োটি থাক থাক ভাবে ওপরে উঠে গেছে ঠিক পিরামিডের মত। ষাঁড়ের মূর্তিগুলির বিশেষত্ব হল, প্রতিটির ভঙ্গি আলাদা। এক জায়গায় দেখলুম পাথর কেটে মোষবলির অনুষ্ঠানটি দেখানো হয়েছে নিখুঁত ভাবে। এই মন্দিরটি পুরোপুরি দ্রাবিড় স্থাপত্যশৈলীর মেনে তৈরি হয়নি বোঝা যায়। জীবজন্তুর মুখের গড়ন দেখে চৈনিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

জমি থেকে প্রায় ছয় ফুট নিচে মন্দিরের চাতাল। বোঝাই যায় অনেকটা মাটি খুঁড়তে হয়েছে। এখানে দুদণ্ড বসলে মন বেশ উদাস হয়ে যায়। আমাদের বহু পুরুষ আগে এই জায়গাটি কত না জমজমাট ছিল, কত লোকের যে স্পর্শ রয়েছে এখানে। কী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে বানানো এর প্রতিটি অংশ। তাঁরা তখন কি ভেবেছিলেন হাজার বছর পরে লোকে মাটি খুঁড়ে খুঁজে পাবে এ রত্ন ভান্ডার আর মুগ্ধ চোখে শুধু চেয়ে থাকবে। হরপ্পা কোনদিন যাওয়া না হলেও সেখানকার বিখ্যাত জলাধারটির ছবি ভীষণ চেনা। এখানকার জলাধারটি দেখেও অবিকল সেই ছবির মত লাগল। তবে যেটা ভীষণ টানছিল, তা হল জলাধারটির ঠিক মাঝখানে একটি পাথরের যন্ত্র - অবিকল আধুনিক যুগের ভালভের মত দেখতে। তবে কি এটি ফোয়ারা? জানার আজ আর কোনও উপায় নেই।

শোর টেম্পলটি বেশ বড়। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটাই সময় লেগে গেল। মন্দিরের পাশেই নীল সমুদ্র, বেশ ভালোই ঢেউ রয়েছে। উত্তাল সমুদ্র, চিকচিকে সোনালি বালি আর আশেপাশের মেলার পরিবেশ ভীষণভাবে পুরীর সমুদ্রকে মনে করিয়ে দেয়। পাড়ে বসে ঢেউ গুনেই দিব্যি সময় কেটে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়েও কোনও নৌকা বা জাহাজ অবশ্য চোখে পড়ল না। আশেপাশে অনেক সীফুডের রেষ্টুরেন্ট আছে। তার অনেকগুলিতেই বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা - এখানে হাঙর পাওয়া যায়। হাসি পায়, জলে হাঙর মানুষ খায় আর ডাঙায় মানুষ ওদের। ও হ্যাঁ, সুযোগ বুঝে সমুদ্দুর চ্যাটার্জীদার চটি নিয়ে পালিয়েছিল। আবার একটু পরে ফিরিয়েও দিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলতে শুনলুম - সমুদ্র কিছুই নেয় না, সব ফিরিয়ে দেয় বলেই তো জানি। বাকি মন্দিরগুলোও যদি ফিরিয়ে দেয় কোনদিন!

দুপুরের খাওয়া সেরে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন দেখতে চললাম। এটিই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট যা রাস্তা থেকেই বিনা পয়সায় দিব্যি দেখা যায়। খাড়া পাহাড়ের গা কেটে কেটে তৈরী করা এই অপরূপ শিল্পকর্মের জুড়ি মেলা ভার। একমাত্র অজন্তা ইলোরাই বোধহয় পাল্লা দিতে পারে। এখানে গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের পৌরাণিক কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে। পাশে তপস্যারত অর্জুনেরও মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভীষণ সুন্দর লাগল হাতির দলটি - এর মধ্যে বাচ্চা হাতিসহ সুখী হস্তীপরিবারও চোখে পড়ল। কালো ভয়ঙ্কর শক্ত এই গ্র্যানাইট পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তিগুলি কি নিখুঁত ভাবেই না বানানো। ও হ্যাঁ, একটি বাচ্চা সহ হনুমানের পাথরের মূর্তিও রয়েছে পাশেই - আর একজন মায়ের মাথার পোকা বাছছে মনে হল। এত বছর পরেও প্রত্যেকের মুখভঙ্গি সহজেই চেনা যায়। পিছনে কানে এল চ্যাটার্জীদার উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি -

কত শত মাইকেল এঞ্জেলো
একদা এই ভারতবর্ষে ছেলো।

ফিরে তাকাতেই হেসে ফেললেন ফিক করে। ভাবলুম, কবি বৈকুণ্ঠ মল্লিক মোটেও কিছু ভুল বলেননি।

এখান থেকে বাঁয়ে তাকাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। বিশাল এক পাথর প্রায় ঝুলছে পাহাড়ের কিনারায়। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, পাথরটির এই আকৃতির জন্য এর নাম হয়েছে কৃষ্ণের মাখনের ডেলা। বিপজ্জনক অবস্থানের জন্য বহুবার এটিকে নিচে গড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। হাতী দিয়ে ঠেলেও কোন লাভ হয়নি - মাখনের ঢেলা গড়িয়ে পড়েনি। সাবধানে ওপরে উঠে পরীক্ষা করেও ঠিক বোঝা গেলনা কিভাবে এটি বছরের পর বছর ধরে এভাবে ঝুলছে।

এর পাশেই রয়েছে বরাহ মন্ডপ। যথারীতি পাথরের কাজ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ভিতরের পাথরের দেওয়ালগুলি কেটে কেটে বিভিন্ন মূর্তির মাধ্যমে নানা পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত আছে। বরাহরূপী বিষ্ণু এবং দুর্গামূর্তি দুটি এককথায় অপূর্ব।

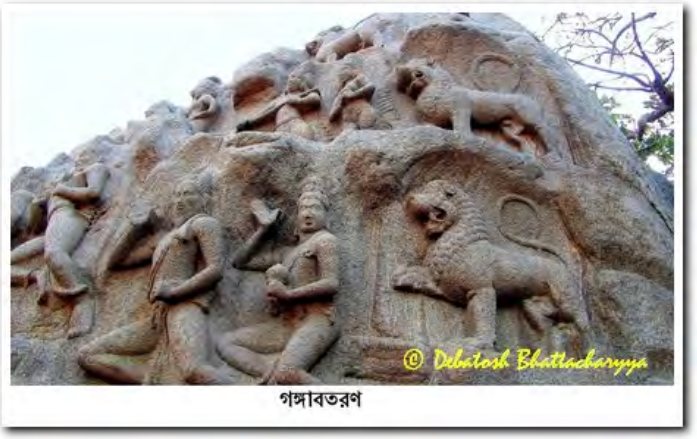

গঙ্গাবতরণ

তবে যেটির কথা না বললেই নয় সেটি হল গোবর্ধন মণ্ডপ। তপস্যারত অর্জুনের পাশেই এটি। ভিতরে গেলেই চোখে পড়বে পাথর কেটে দেওয়ালে বানানো হয়েছে কৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত কড়ে আঙুলে তুলে ধরার ঘটনাটি। পাহাড়ের নিচে আশ্রয় নিয়েছে বৃন্দাবনবাসী। এক গাভীর দুধ দোয়ান হচ্ছে, পাশেই দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট বাছুরটি - অন্য সব দেওয়াল মূর্তিই যেন এর কাছে তুচ্ছ। কী স্বাভাবিক তাদের ভঙ্গিমা, কি সরল চোখের চাউনি। আসলে এখানকার প্রতিটি মণ্ডপই একটা বিশাল পাথর কেটে বানানো। মাঝে মাঝে পাথরের থাম পুরো ওপরের ওজনটি ধরে রেখেছে। হাজারের ওপর বয়স হলেও সবই প্রায় একইরকম ও অক্ষত রয়েছে বলা যায়।

বরাহগুহা

পরের দিন সবারই একটু স্বাদ বদলের ইচ্ছে জাগল। শুনেছিলাম মহাবলীপুরমের অদূরেই আছে একটি নামকরা কুমীর পার্ক, ভাবলুম ঘুরেই আসা যাক। ইস্ট কোস্ট রোডের ওপরই এই পার্কটি বানিয়েছিলেন রোমিউলাস হোইটকর, ১৯৭৬ সালে। প্রায় আট একর জায়গায় নানা প্রজাতির কুমীর, কচ্ছপ ও সাপ পালন করা হয়। সাপের বিষ সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই গরমের সময় তাদের প্রজননকাল বলে সেটি বন্ধ। বিশাল বিশাল পোষ্টার চতুর্দিকে - পড়লে জানা যায় এদের খাদ্যাভাস, জীবনশৈলী ও আরও নানা অজানা কথা। এক জায়গায় লেখা রয়েছে - বাচ্চা বেরনোর সময় নাকি কুমীর ডিম মুখে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আর তাতেই ডিম ফেটে কুমীর ছানা বেরিয়ে পড়ে। মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম তো অনেক দেখা, এখানে এলে দেখা যাবে কুমীরের অ্যাকোয়ারিয়াম। অনেক বিদেশি প্রজাতির সরীসৃপও আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইগুয়ানা - বাবাজী মনে হল ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে হাসছে। একটি কড়ে আঙুল সমান কচ্ছপও আছে কাঁচের ঘেরা জায়গায়, গায়ে তার অপরূপ কারুকার্য।

ফেরার পথে পড়ল টাইগার কেভ, একেবারে সমুদ্রের পাড়েই এটি। চতুর্দিকে বাঘের মুখ - আকৃতি দেখে বোঝাই যায় দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। কেন এই ধূ ধূ প্রান্তরে এই একটিমাত্র গুহা বানান হয়েছে, তার উত্তর জানা আজ আর সম্ভব নয়। কয়েক ফুট গভীর গর্ত দেখে পরিষ্কার যে মাটি খুঁড়ে এটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কি নিচে আরো কিছু আছে? নাকি পল্লবদের কোন বৃহৎ প্ল্যানের অংশ ছিল এটি - যা দুর্ভাগ্যবশতঃ অসমাপ্ত রয়ে গেছে!

মহিষাসুরমর্দিনী মণ্ডপটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। পাশের সমুদ্রের ঢেউয়ে কিছুক্ষণ পা ভিজিয়ে নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়লুম দেখতে। বেশ খানিকটা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় এখানে। মহিষাসুরমর্দিনী মণ্ডপের দেওয়ালের দুটি কীর্তির কথা উল্লেখ করতেই হয় - একটি মা দুর্গার মহিষাসুর বধ ও অপরটি বিষ্ণুর অনন্তশয্যা। এর মধ্যে সিংহের পিঠে রণরঙ্গিনী দুর্গার কাজটি বেশ জটিল। মহিষের মুখ বসানো অসুরটিকে যেভাবে পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে, তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

মহিষাসুরবধ

সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতীয় দেবদেবীর নাম ও মূর্তিগুলি বেশ অন্যরকম হয়, কিন্তু পল্লবদের মণ্ডপগুলিতে যে মূর্তি দেখলাম তা আমাদের বিশেষ পরিচিত। বিষ্ণুর অনন্তশয্যা দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার অন্যান্য প্রাচীন সৃষ্টির সঙ্গে এখানেই বেশ অমিল। এমনকি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও কোথাও কোথাও উপস্থিত, যা বেশ অবাক করে। আর্য, দ্রাবিড়ীয় এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক আশ্চর্য মেলবন্ধন প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে।

পরের দিন ফিরে আসার পালা। চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশনে বসে বসে ভাবছিলুম - ছোটবেলায় পড়া ইতিহাস বইটা একবার খুঁজে দেখলে হয়! তখন ছিল শুধুই মুখস্ত করে যাওয়া, কিন্তু চোখের সামনে এই অসাধারণ কীর্তিগুলি দেখতে দেখতে চোল পল্লবদের ইতিহাস একবার ঝালিয়ে নিলে মন্দ হয় না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ চোলরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্ব ছিল কর্ণাটকে, তিনি সারাজীবন যুদ্ধ করে রাজত্ব বিস্তার করে গেছেন। তাঁর নজর পরে পল্লবদের ওপর। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ যুদ্ধে হেরে গেলেও পুলকেশী রাজধানী কাঞ্চীপুরম দখল করতে পারেননি। প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীণ হয়ে ফিরে যেতে হয় তাঁকে। মহেন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন প্রথম নরসিংহবর্মণ। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা, পিতা মহেন্দ্রবর্মনের পরাজয় তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। পল্লব রাজ্যের বাড়বাড়ন্ত দেখে একদিন আবার আক্রমণ করে বসলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। কিন্তু একের পর এক পরাজয়ের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। শেষে স্বয়ং নরসিংহবর্মণ যুদ্ধে হত্যা করেন পুলকেশীকে। ইতিহাসে তা বিখ্যাত হয়ে আছে বাতাপীর যুদ্ধ নামে। কথিত আছে, বিজয়ী নরসিংহবর্মণ নাকি চোলরাজ্য থেকে ধরে নিয়ে আসেন শিল্পীদের - তাঁরাই বানিয়েছেন মহাবলীপুরমের এই কালজয়ী অপরূপ কীর্তিগুলি।

শতাব্দী এক্সপ্রেসে জানলার ধারের সীটটি বাগিয়ে চ্যাটার্জীদা বললেন - এ যেন সেই সত্যযুগে আবার ফিরে যাওয়া হে! না এলে সত্যিই খুব মিস করতুম!!

শোর টেম্পল

~ মহাবলীপুরমের আরও ছবি ~

প্রবাসী বাঙালি দেবতোষ ভট্টাচার্য কর্মসূত্রে আজ বহু বছর বাঙ্গালোরের বাসিন্দা। ফটোগ্রাফির প্রবল নেশা - আর এই নেশার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায়ই তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয় ঘর ছেড়ে। অবসর সময়ে অল্পবিস্তর লেখালেখির বদভ্যাস থাকলেও, 'আমাদের ছুটি'তেই প্রথম ভ্রমণকাহিনি লেখা তাঁর। লেখার মাধ্যমে যদি একবার বেড়াবার নেশাটি কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটাই হবে তাঁর মস্ত পাওয়া।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ম্যাজিক্যাল মংলাজোড়ি

পলাশ পান্ডা

~ *মংলাজোড়ির আরও ছবি* ~

এবারের গন্তব্য মংলাজোড়ি। ওড়িশার খুরদা জেলায়। শীতের কয়েকটা মাস এখানের জলাভূমিতে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি ভিড় করে, যদিও সারা বছরই এখানে পাখিদের দেখা মেলে। দূরে ছোট ছোট টিলা, টিলার কোলে আদিবাসী ধীবরদের বসতি, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ঘন নলখাগড়া ও হোগলার বন – এই নিয়েই চিলকার উত্তর-পশ্চিমে পাখিদের স্বর্গরাজ্য মংলাজোড়ি। মংলাজোড়ি ওয়েটল্যান্ড প্রায় ৭০ বর্গকিমি বিস্তৃত। জলের গভীরতা কোথাও ৪ মিঃ তো কোথাও ১ মিঃ। অসংখ্য খাঁড়ি ছড়িয়ে রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে।

মংলাজোড়িতে পাখি দেখতে গেলে হাতে অন্তত দিন দুই সময় রাখা দরকার, কিন্তু এক দিনই সময় বের করতে পারলাম আর বেরিয়ে পড়লাম পাখিদের স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশ্যে। ২১ জানুয়ারি আমি ও আমার এক মাস্টারমশায় বন্ধু হলদিয়া থেকে লোকাল ট্রেনে খড়্গপুরে এসে বিকেল সাড়ে চারটের করোমন্ডল এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম- গন্তব্য ভুবনেশ্বর। প্ল্যানটা একটু আলাদা ভাবে করেছিলাম। মংলাজোড়িতে থাকাটা একটু খরচের হওয়ার জন্য আমরা ওখানে না থেকে ৭০ কিমি দূরে ভুবনেশ্বরে রাত্রিবাস করার পরিকল্পনা করি। ট্রেন ঘন্টাখানেক লেট করায় ভুবনেশ্বরে পৌঁছতে রাত্রি প্রায় এগারটা হয়ে গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওখানেই রাতের খাওয়া সেরে অটো ধরে পূর্বনিধারিত হোটেলে পৌঁছালাম।

পরের দিন সকাল সাতটা দশ-এর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে চেপে কালুপাড়াঘাট স্টেশনে নেমে বাইরে বেরিয়ে অটোতে টাঙ্গি হয়ে বামদিকের রাস্তা ধরে পৌঁছে গেলাম মংলাজোড়ি। বোটের জন্য আগে থেকেই মধু বেহেরাকে ফোন করে রেখেছিলাম। অটো থেকে নেমে আমাদের জিনিসপত্র মধু বেহেরার গেস্টহাউসে রেখে ওনার ঠিক করা অটোতে চেপে বসলাম।

সরু মোরামের রাস্তা ধরে যখন অটো জলাভূমির দিকে এগোতে লাগল প্রথমেই চোখে পড়ল প্রচুর শামুকখোল। খাবার খুঁজতে খুঁজতে প্রায় রাস্তার একদম ধারে চলে এসেছে। গ্রে হেডেড সোয়াম্পহেন ও কমন মুরহেন-এর সংখ্যাও নজর কাড়ল। কিছুটা দূরে একটা ব্ল্যাক হেডেড আইবিস ও কিছু পিনটেল ভেসে রয়েছে। ঘাটে পৌঁছাতে খানিক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে অনেকেই নৌকা নিয়ে ভেসে পড়েছেন, আবার কোনও কোনও নৌকার ফেরার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নৌকাতে উঠে বসলাম, সঙ্গে আমাদের গাইড, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ও সেলিম আলির একটা বই।

ব্ল্যাক টেইল্ড গডউইট (Black-tailed godwit)

ঠিক করেছিলাম সারাদিনে দুবার বোটিং করব, সেইমত গাইড প্রথমে ডানদিকের বড় চ্যানেলটিকে বেছে নিয়ে চলা শুরু করল। প্রথমেই হাতের কাছে পেয়ে গেলাম ব্ল্যাক উইংগড স্টিল্ট ও ব্ল্যাক টেইল্ড গডউইট। এই ওয়েটল্যান্ডে সবথেকে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় ব্ল্যাক টেল্ড গডউইট। স্টিল্ট ও ব্ল্যাক টেইল্ড গডউইট এমন ভাবে বসে রয়েছে যেন মনে হবে কেউ সাদা-কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এত কাছ থেকে এদের পেয়ে খুব সুন্দর কিছু ছবি পাওয়া গেল। ওদের যখন ছবি নিতে মগ্ন ছিলাম, সেই সময় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে দুটো রাডিশেল ডাক কিছুটা দূরে এসে বসল। ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগোতে লাগলাম, কিন্তু কাছে যেতেই উড়ে গেল। কিছুটা এগোতে দেখতে পেলাম কয়েকটা নর্দার্ন পিনটেইল আপন মনে খাবার খুঁজছে। শীতের শুরুতে এরা যখন এখানে আসে, এত লম্বা উড়ানেরর পর তখন এদের শরীর একদম রুগ্ন থাকে, তারপর এখানের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে অজস্র খাবার খেয়ে চেহারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। আমরা যখন নর্দার্ন পিনটেইলের ছবি নেওয়ার মগ্ন তখন হঠাৎ গাইড ইশারা করে দেখাল, একটা নর্দার্ন শোভেলার সেই ঝাঁকের মধ্যে বসে রয়েছে। কিন্তু ভাল করে দেখার আগে ঝপাৎ করে উড়ে গেল, টেরই পেলাম না। গাইড আমাদের আশ্বস্ত করল পরে আরও কাছ থেকে ওদের দেখতে পাওয়া যাবে।

ওখান থেকে নৌকা ঘুরিয়ে ডানদিক বরাবর চলতে লাগলাম। একটু দূরেই দেখতে পেলাম একটি পার্পল হেরন একটা আস্ত মাগুর মাছকে ধরে খপাত করে মুখে পুরে নিল। এবার চলে এলাম নর্দার্ন শোভেলার-এর এলাকায়। ওখান থেকে ওদের কিছু ভালো ছবি পাওয়া গেলো সঙ্গে পিনটেইলেরও। এইভাবে যে কখন ঘড়িতে প্রায় বারোটা ছুঁই ছুঁই টের পাইনি, খেয়াল হল পেটের টানে। তাড়াহুড়োর জন্য ভালো করে জলখাবার না করেই নৌকোতে উঠে পড়েছিলাম, খিদের জ্বালাটা ভালোই অনুভব করছি। মাথার ওপর রোদ্দুর আর পেটে খিদে, দেরি না করে মাঝিকে বললাম নৌকো ঘাটে নিয়ে যেতে। ঘাটে যাওয়ার রাস্তাতেই দেখতে পেলাম একটা ওয়ার্বলার হোগলা বনের মধ্যে ডেকেই চলেছে। ছবি পাওয়ার জন্য ওখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। মিনিট পাঁচেক পরে দেখলাম মহাশয় বের হলেন সঙ্গে একটি কমন স্নাইপও। আমরা ওদের কয়েকটা ছবি নিয়ে সোজা পাড়ে এসে উঠলাম।

পাড়ে ফিরে কিছুক্ষণ অটোর জন্য অপেক্ষা করতে হল। সেই সময় কানে এল, একটু দূরে একটি ছোট্ট পাখি শিস দিয়ে চলেছে, খানিক কাছে যেতে বুঝতে পারলাম ওটা একটি সাইবেরিয়ান ব্লুথ্রোট। আমাদের অটোচালক এসে ওড়িয়া ও হিন্দির সংমিশ্রণে কিছু বলতে লাগল, যার সারাংশ হল সামনের ঝোপে মধ্যে একটি সিনামন বিটার্ন বসে রয়েছে, তৎক্ষণাৎ অটোতে চেপে বসলাম। পৌঁছে দেখি ফুট দশেক দূরে একটি সিনামন বিটার্ন হোগলা ঝোপের মধ্যে শিকারের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। জীবনে এই প্রথম সিনামন বিটার্ন দেখলাম। কয়েকটা ছবি তুলে আর দেরি না করে মধু বেহেরার গেস্টহাউসে এসে পৌঁছলাম।

সিনামন বিটার্ন (Cinnamon bittern)

দুপুরের খাবার রেডি ছিল, তাই সোজা টেবিলে গিয়ে বসে পড়লাম। খেতে খেতে দুজন প্রকৃতিপ্রেমীর সঙ্গে পরিচয় হল, পরিযায়ী পাখির টানে এখানে এসেছেন ওঁরা। আজ ও কাল এখানেই থাকবেন। লাঞ্চ শেষ করে দুটো চেয়ার নিয়ে গেস্টহাউসের পেছনে এসে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসলাম। গল্প করতে করতে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি তিনটে বাজতে আর বেশি দেরি নেই। সঙ্গে সঙ্গে অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আপাতত শেষবার মংলাজোড়ির বুকে ভেসে বেড়াতে। ঘাটে পৌঁছে গাইডকে বললাম হাতে সময় কম, তাই তাড়াতাড়ি বারহেডেড গুজ-এর কাছে নিয়ে যেতে।

নর্দার্ন পিনটেইল (Northern pintail)

মংলাজোড়িতে বারহেডেড গুজ-এর সংখ্যাটা খুবই কম। এখানকার তুলনায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গজলডোবা বা বক্রেশ্বর ড্যামে এই বারহেডেড গুজ-এর আধিক্য চোখে পড়ার মতন। আমাদের কথা মতন মাঝিভাই বাঁদিকের বড় চ্যানেলটিতে নৌকা ভাসিয়ে দিল। পড়ন্ত দুপুরের মিঠে রোদ্দুরটা বেশ ভালই লাগল। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ল একটি স্মল প্রাটিনকোল। এদের গায়ের রং এমনই যে দূর থেকে দেখলে কিছুতেই বোঝা যাবে না, মনে হবে যেন মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে। যেই না আমাদের নৌকা কাছাকাছি গিয়েছে, এতক্ষণ মাটির সঙ্গে মিশে থাকা প্রায় কয়েকশ প্রাটিনকোলের ঝাঁক মাথার ওপরের আকাশটাকে ঢেকে ফেলল। এত কাছে থাকায় কিছু সুন্দর ছবি পাওয়া গেল। সকাল থেকেই কিছু হুইসকার্ড ট্রেনদের মাথার ওপর ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলাম, এখন দেখি তারা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে। আমরা যখন তাদের ফটো তোলায় মগ্ন, গাইড আমাদের নজর ঘোরাল দুটো বারহেডেড গুজ দম্পতির দিকে। অনেক দূরে আপন মনে খাবার খুঁজে চলেছে। গাইডের কথা অনুযায়ী, এ বছর এরা খুব একটা কাছে আসছে না। আমরাও খানিক অপেক্ষা করে ওদের কাছাকাছি পেলাম না। যাইহোক ভালো ফটো নাই পেলাম, চোখে তো দেখতে পেলাম এই সান্ত্বনা। মার্শ হ্যারিয়র ও ব্রাহ্মণী চিলের দর্শন-এর জন্য কিছুটা এধার ওধার নৌকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম, ব্রাহ্মণী চিলের দেখা মিললেও এবারের মত মার্শ হ্যারিয়র-এর দেখা পেলাম না। মংলাজোড়িতে সবথেকে সুন্দর দৃশ্য হল মার্শ হ্যারিয়র-এর তাড়া খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গডউইটের নীল আকাশের বুকে উড়ে বেড়ানো। সেই দৃশ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম। নৌকা যখন হ্যারিয়র এর খোঁজে এপাশ ওপাশ ঘুরছে তখন একটু দূরে একটি পায়েড কিংফিশার মাছ ঠোঁটে নিয়ে অনবরত পাথরের ওপর আছাড় মারছে, সেই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করলাম। হাতে আর সময় নেই, সুতরাং মাঝি ভাইকে পাড়ের দিকে এগোতে বললাম। ফেরার পথে দেখতে পেলাম ইয়েলো বিটার্ন, বেইলনস ক্রেক, লিটল স্টিন্ট, প্লোভার, স্পট বিল ডাক, ওয়াটার কক, কমন মুরহেন আর গ্রে-হেডেড সোয়াম্প হেন।

নৌকা যখন ঘাটের কাছাকাছি তখন আমাদের গাইড পাশের নৌকাটির দিকে ইশারা করে এক ব্যক্তিকে দেখাল, যিনি হলেন এই মংলাজোড়ি ওয়েটল্যান্ডের রূপকার নন্দকিশোর ভুজবল। আজ এই ওয়েটল্যান্ড এর সংরক্ষণের পেছনে ওঁর অবদান বিরাট। বছর দশেক আগে পর্যন্ত এই জায়গায় অবাধ চোরাশিকার চলত। নন্দকিশোরজী তখন এখানকার মানুষজনকে বোঝাতে শুরু করলেন যে এই সব প্রাণীদের মেরে না ফেলে এদের সংরক্ষণের মাধ্যমেও ভালোভাবে জীবিকা অর্জন করা যায়। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ওড়িশা সরকার তাঁকে 'বিজু পট্টনায়ক' পরিবেশ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। মাঝিভাই বলল, এখনও নন্দকিশোরজী প্রায়ই নিয়ম করে এই ওয়েটল্যান্ড পর্যবেক্ষণে বের হন।

ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা বাজে, আমাদেরও পাখিদেখা এবারের মত শেষ। নৌকা থেকে নেমে মাঝি ও গাইডকে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে অটোতে চেপে বসলাম ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে।

নর্দার্ন শোভেলার (Northern shoveler)

ব্ল্যাক উইংগড স্টিল্ট (Black-winged stilt)

~ *মংলাজোড়ির আরও ছবি* ~

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কম্পিউটার অপারেটার পলাশ পান্ডা-র শখ ফোটোগ্রাফি ও বেড়ানো।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

-->

যেখানে রূপকথা মিশে আছে প্রকৃতিতে

অনিরুদ্ধ ভৌমিক

রূপকুণ্ড ট্রেক রুট ম্যাপ || *ট্রেকের আরো ছবি - ১ - ২*

যেখানে ইতিহাস মিশে আছে রূপকথায়, রূপকথায় জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাস, আর বিশ্বাস নিমজ্জিত হয়েছে প্রকৃতিতে - ঠিকই ধরেছেন, এবারের যাত্রা সেই বহুচর্চিত রূপকুণ্ডের পথে।

গাড়োয়াল হিমালয়ের ১৬,৪৭০ ফুট উচ্চতায় ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, কালিডাক শৃঙ্গের তটস্থ প্রহরায় এই রূপকুণ্ডের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তিন-চারশো নরকঙ্কাল, যাদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা জনশ্রুতি রয়েছে।

যাত্রা শুরু সকাল সাড়ে আটটার হাওড়া- লালকুঁয়া উইকলি সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। আমরা দুই স্বামী-স্ত্রী আঠাশ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে পরের দিন বেলা সাড়ে দশটায় নির্ধারিত সময়ের দু ঘণ্টা পরে পৌঁছলাম লালকুঁয়া স্টেশনে। স্টেশনচত্বর থিকথিক করছে নৈনিতাল যাওয়ার টুরিস্টের দলে। আমাদের আজকের গন্তব্য 'ওয়ান'। লালকুঁয়া থেকে যার দূরত্ব ২৬০ কি.মি.। আগের থেকে দু জনের জন্য গাড়ি বুকিং করে না রাখায় বেশ বিপত্তির মুখে পড়তে হলো। সৌভাগ্যক্রমে কলকাতা থেকে আসা আরেকটি ট্রেকিং দলের বদান্যতায় তাদের রিজার্ভ করা গাড়িতে জায়গা পেলাম। বেলা বারোটা নাগাদ গাড়ি হলদোয়ানির সমতল ভূমি পেরিয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরল। একে একে ভাওয়ালি – রানিক্ষেত – গোয়ালদাম – থারোলি - দিওয়াল – মুন্ডোলি হয়ে লোহারজং যখন পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে রাত পৌনে দশটা। লোহারজং থেকে রূপকুণ্ড যাওয়ার দুটো ট্রেক রুট বিভক্ত হয়ে গেছে, একটি ওয়ান ও অপরটি দিন্দাগ্রাম হয়ে। অনেকে ওয়ান থেকে শুরু করে দিন্দাতে শেষ করে আবার দিন্দা দিয়ে শুরু করে ওয়ানেও শেষ করা যায় অথবা ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ানেও শেষ হয়।

মিনিট দশেকের বিরতির পর গাড়ি ছাড়ল ওয়ান-এর উদ্দেশ্যে। লোহারজং থেকে ওয়ানের দূরত্ব ১৪ কিমি। ইতিমধ্যে হাওয়ায় বেশ হিমেল আমেজ। নিশুতি রাতে সামনের পাহাড়গুলোর গায়ে একটা দুটো আলো দেখা যাচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে এক ঐরাবতের গায়ে জোনাকি লেগে রয়েছে। রাস্তা বেশ খারাপ, আর দুর্ধর্ষ সব হেয়ারপিন বেন্ড। এভাবে দশ মিনিট গাড়ি চলার পর হঠাৎ বাঁক ঘুরতে দেখি এক হিমালায়ান আইবেক্স। এতবার হিমালয়ের আনাচে কানাচে ঘুরেও যা কোনদিনও দেখতে পাইনি। আইবেক্সটা হঠাৎ রাস্তায় নেমে আসায় ড্রাইভার জোর ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করালেন। আমরা আনন্দে আত্মহারা, বেচারা প্রাণীটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে উঠে গেল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পরের বাঁকটা নিতেই আমরা স্তম্ভিত। রাস্তার ধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে আরও একটি জন্তু। প্রকাণ্ড তার লেজ। লাল জ্বলন্ত তার চোখ। দৃশ্যটা আমাদের চোখে ধাতস্থ হতে বুঝতে পারলাম, এটি একটি পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড। এসেছি ট্রেকিং করতে, কিন্তু দর্শন মিলল দুটি বিরল প্রজাতির প্রাণীর – এ তো মেঘ না চাইতেই জল। ড্রাইভার সাহেব জানালেন – 'আপনারা ভাগ্যবান। এই রাস্তায় আইবেক্স দেখা গেলেও লেপার্ড দেখা যায় কদাচিৎ।'

ওয়ান গ্রাম

ওপরে উঠে কেমন একটা হয়ে গেলাম। যখন ওয়ান-এ পৌঁছালাম, ঘড়ির কাঁটায় রাত সাড়ে দশটা। রাস্তায় অপেক্ষা করছিল আমাদের গাইড বলবীর সিং বিস্ত। বলবীর নিয়ে এল তার নিজের বাড়িতে। এত রাতেও বাড়ির অন্যান্য সভ্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমরা আপ্লুত। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে গরম গরম রুটি, চানা, ও মিক্সড সবজি খেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম। পরদিন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, প্রাতরাশ সেরে তৈরি হয়ে নিলাম আমাদের প্রথমদিনের ট্রেকিং-এর জন্য। আজকের গন্তব্য 'ঘারোলি পাতাল'। দূরত্ব ৮ কিমি, উচ্চতা ১০,০০৮ ফুট। ওয়ান জিপ স্ট্যান্ড থেকে পাঁচশো মিটার এগোতেই পাইনের জঙ্গলের মধ্যে পড়ল লাটু দেবজীর মন্দির। বলবীরের বক্তব্য অনুযায়ী রূপকুণ্ডের যাত্রা শুরুর আগে লাটু দেবজীর অনুমতি নিয়েই এগোতে হয়। দেবতার কাছে সফল ও সুস্থ ভাবে ফেরার প্রার্থনা জানিয়ে এগিয়ে চললাম। ২ কিমি. হাল্কা চড়াই ভেঙে পৌঁছলাম 'রানকা দ্বার'। জায়গাটা বেশ সুন্দর। এখানে বনদপ্তরকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাতে ও প্রবেশ মূল্য জমা দিতে হয়। এখান থেকে আশপাশের পাহাড়, জঙ্গল, নিচে ফেলে আসা ওয়ান গ্রামের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ দেখতে পাওয়া গেল। পথ ধীরে ধীরে ওক-পাইনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নীলগঙ্গার দিকে নামতে থাকল। নীলগঙ্গা পেরোতেই আবার চড়াই শুরু। এরপর থেকে জঙ্গল আরও ঘন হয়ে উঠল। বলবীরের নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছলাম 'ঘারোলি পাতাল।'

পৌঁছে দেখি একটি নামজাদা ট্রেকিং গ্রুপ গোটা মাঠ জুড়ে তাদের তাঁবুর মেলা বসিয়েছে। এই শান্ত পরিবেশে নিজেদের প্রকৃতির মধ্যে সম্মোহিত রাখতে একটু উঁচু জায়গাতেই তাঁবু ফেললাম। যেখান থেকে পুরো 'ঘারোলি পাতাল' দেখা যাচ্ছে কিন্তু ট্রেকিং গ্রুপের কোলাহল অতটা কানে আসছে না। পাহাড়ের সন্ধে খুব চুপিসাড়ে নেমে এল। বাকি ট্রেকারদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে এখানকার একমাত্র অস্থায়ী ধাবাতে আটটা নাগাদ আমাদের রাতের খাবারের ডাক পড়ল। কনকনে ঠান্ডায় গরম গরম খিচুড়ি, পাঁপড় স্যাঁকা, ডিমভাজা ও ঘি - সারাদিনের ক্লান্তিকে এক নিমেষে দূর করে দিল। রাত বাড়তে থাকায় ঠান্ডাও বাড়তে থাকল। তাই আর সময় নষ্ট না করে তাঁবুতে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

ঘারোলি পাতাল ক্যাম্পসাইট

ভোর সাড়ে পাঁচটায় বলবীর বেড টি দিয়ে ঘুম ভাঙাল। তাঁবুর বাইরে এসে দেখি চারদিকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা লেগে রয়েছে। গাছ থেকে শুকনো পাতা খসার আওয়াজও যেন কানে বিঁধছে। পুব আকাশে হাল্কা মেঘের আমেজ। বেলা বাড়লে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। আজকের গন্তব্য 'বেদিনী বুগিয়াল' (উচ্চতা ১১,৬০০ ফুট) ভায়া 'আলি বুগিয়াল'; আলু পরোটা আর কফি খেয়ে যখন যাত্রা শুরু করলাম ঘড়িতে সকাল সাতটা। পাহাড়ি জঙ্গলের রাস্তায় এবার ভালোই চড়াই-এর স্বাদ পাচ্ছি। ক্রমে ক্রমে ট্রি-লাইন পাতলা হতে শুরু করেছে। ঘন মহীরুহের বদলে চোখে পড়ছে ছোট ছোট রডোডেনড্রনের ঝোপ। এবারও এপথে চলতে গিয়ে দেখা হল কলকাতা থেকে আসা সেই ট্রেকিং দলের। আলাপ হল ওদের ট্রেক লিডার কমবয়সী কিন্তু অভিজ্ঞ সুচেতনের সঙ্গে। এখানে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা খুব পিচ্ছিল ও কাদায় ভর্তি। তাই একটু সচেতন হয়ে সুচেতনের বিভিন্ন ট্রেকিং অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম আলি বুগিয়াল। এশিয়ার বৃহত্তম এই বুগিয়াল বা ঘাস জমি। সমগ্র বুগিয়ালটি বিস্তৃত কুড়ি বর্গকিমি জায়গা জুড়ে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সবুজ গালিচায় ঘুরে বেড়ালে ঘোড়া ও ভেড়ার দলের সঙ্গে নীল আকাশের সামিয়ানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অনায়াসে সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। ক্যালেন্ডারের ছবির মতন আলি বুগিয়াল দেখতে গিয়ে কখন যে দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। তাই আর দেরি না করে হাঁটা শুরু করলাম বেদিনীর উদ্দেশ্যে।

বেদিনী বুগিয়াল থেকে দেখা চৌখাম্বা রেঞ্জ

আলি থেকে বেদিনী যাওয়ার রাস্তা প্রথম দিকে চড়াই হলেও পরের দিকে বুগিয়ালের ঢালের মধ্য দিয়ে নেমে যেতে দারুণ লাগল। বেদিনীতে পৌঁছালাম বেলা তিনটেয়। সেখানে পৌঁছে দেখি এ তো ট্রেকারদের মহামিলন বসেছে। যতটা সম্ভব নিজেদের তাঁবু এক কোলাহলহীন না হলেও অপেক্ষাকৃত শান্ত জায়গায় লাগালাম। ক্রমে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে শুরু করল। দেখতে দেখতে ধূম্রাকৃতি মেঘের চাদর সমগ্র জায়গাটা গ্রাস করে নিল। শুরু হল হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। তার সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার দাপাদাপি। ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টির পাদদেশে এসেও তাদের দেখতে না পাওয়ায় এক তীব্র আক্ষেপ হল। এখানেও অস্থায়ী ধাবাতে বাকি ট্রেকারদের সঙ্গে গল্প করে রাত আটটার মধ্যে খাবার খেয়ে তাঁবুতে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

সারারাত হাওয়ার দাপটে ভালো করে ঘুম হল না। ভোর হতে দেখি আবহাওয়ারও বিশেষ কিছু পরিবর্তন নেই। বরং নীচ থেকে আরও মেঘ এসে ওপরে জমা হচ্ছে। সময় নষ্ট না করে চটজলদি তৈরি হয়ে নিলাম আমাদের পরের গন্তব্য 'পাথার নাচানী' -র জন্য। উচ্চতা ১২,৭০০ ফুট, দূরত্ব ৫ কিমি., ২০০ মিটার মতো এগোতেই পড়ল 'বেদিনী কুণ্ড।' বিস্তৃত ঘাসজমির মধ্যে এই কুণ্ড বেশ দৃষ্টিনন্দন। এই মাঠ বা ঘাসজমির অপর নাম হল 'শিরদোতা', অর্থাৎ এখানে দেবী দুর্গা মহিষাসুরের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন! বেলা বাড়তে থাকলে মেঘ কাটতে শুরু করল। মেঘের আড়াল থেকে প্রথমে দৃশ্যমান হল ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টি, বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, বন্দর পুঞ্ছ ও আদি পর্বতের মাথা। নীল আকাশের ক্যানভাসের ওপর দন্ডায়মান ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টি ও চারপাশে বিস্তৃত সবুজ বুগিয়ালের দৃশ্য শুধু লিখে কেন DSLR-এও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মানুষ যে কত ক্ষুদ্র এই বৃহত্তর প্রকৃতির কাছে তা হয়ত এই বিশালত্বের পাদদেশে দাঁড়ালে তবেই অনুভব করা যায়।

প্রকৃতির রঙের ছটা দেখতে দেখতে দু কিমি দূরে 'ঘোড়ালোটানি'-তে এসে পৌঁছলাম, ঘোড়ালোটানি থেকে দেড় কিমি এগোতেই চোখে পড়ল কালিডাক পিক। এখান থেকে পাথার নাচানী দেড় কিমি - রাস্তা সংকীর্ণ হলেও মোটামুটি সমান্তরাল। পাথার নাচানী পৌঁছালাম বেলা একটায়। 'ঘারোলি পাতাল'-এর পর এই পাথার নাচানীর কয়েকটি বিশেষ জায়গাতেই মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। এখানে রয়েছে দুটি অস্থায়ী ধাবা ও বনদপ্তরের ফাইবার টেন্ট-এর ব্যবস্থা। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়াতে আমরা পাথার নাচানীতে না থেমে খানিকটা এগিয়ে রইলাম 'কালু ভিনায়ক'-এর দিকে। সন্ধে থেকে বৃষ্টি শুরু হল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার প্রকট মূর্তি ধারণ করল। সঙ্গে দুর্দান্ত হাওয়ার দাপট। মনে হচ্ছে এই বুঝি তাঁবু সমেত আমাদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

সকালেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হল না। ঘন মেঘের কুয়াশায় দশ মিটারের বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বলবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আর ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। কুকিং টেন্ট ও টয়লেট টেন্ট এত হাওয়ায় লাগানো সম্ভব হচ্ছে না, তাই ক্যাম্পসাইট পরিবর্তন করে পাথার নাচানীতেই নেমে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে অন্তত বনদপ্তরের ফাইবার টেন্ট-এ থাকা ও অস্থায়ী ধাবাতে খাবার পাওয়া যাবে। পৌঁছে দেখলাম আমাদের মতো অনেক ট্রেকাররাই প্রকৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শুরু হল ধৈর্যের পরীক্ষা। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে নামতে না পারলে ফেরার ট্রেন মিস করার সম্ভাবনা আছে। অবশেষে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি শান্ত হল দুপুর তিনটেয়। ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। হাওয়ার দাপটও কিছুটা কমেছে। আরও একটি ট্রেকিং গ্রুপ, তাদের গাইড, আমরা ও বলবীর মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আবহাওয়ার এই সুযোগটা নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না । ঠিক করলাম রাতেই আমরা ট্রেক করব। পাথার নাচানী থেকে কালু ভিনায়ক (১৪১৮৬ ফুট) দু কিমি, সেখান থেকে এক কিমি দূরের 'বাগুয়াবাসা' হয়ে পাথার নাচানীতে ফিরে আসব। গাইডরা কিছুতেই প্রথমে রাজি হতে চাইছিল না,

তাদের ভাষায় এটা শুধু দুঃসাহসিক নয় পাগলামোও বটে। আমরা গোঁ ধরে বসলাম, কালও যদি সকাল থেকে প্রকৃতির এই বিড়ম্বনা শুরু হয় তাহলে এত কষ্ট করে এত দূর এসে আমাদের ফিরে যেতে হবে। অবশেষে আমাদের দৃঢ় মনোভাব দেখে গাইডরা রাজি হল। বাইরে তখন চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। ত্রিশূলের মাথার ওপর চাঁদ যেন রুপো গলানো জল সমস্ত পাহাড়ের ওপর ঢেলে দিয়েছে। আর লক্ষ লক্ষ তারা মণি মানিক্য, জহরতে খচিত কালো চাদর দিয়ে সেই পর্বতশৃঙ্গকে জড়িয়ে ধরেছে। এ দৃশ্য আমৃত্যু আমার স্মৃতির ফ্রেমে বন্দী হয়ে রইল।

বেদিনী বুগিয়াল থেকে পাথার নাচানীর পথে

ঈশ্বরের কাছে আমাদের সুস্থ ও সফলভাবে ফিরে আসার প্রার্থনা জানিয়ে রাত দশটায় ছ'জনের দল ও দু'জন গাইড মিলে যাত্রা শুরু করলাম। সঙ্গে শুধু প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস - জল, শুকনো খাবার, ওষুধ, পঞ্চো, হেডলাইট, ক্যাম্প্রন, টর্চ ও ওয়াকিং স্টিক।

রূপকুণ্ডের পথে

বলবীর জানাল তার জীবনেও এমন দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা এই প্রথম, বাইরের তাপমাত্রা তখন হিমাঙ্কের নিচে। গাইডদের সতর্ক প্রহরায় আমরা সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম। একটা ভুলের মাশুল এখানে অনেক। দলের প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি খুব সচেতন। ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা, পৌঁছলাম কালু ভিনায়াক। এই পথে সবথেকে খাড়াই রাস্তা হল পাথার নাচানী থেকে কালু ভিনায়াক। একটা ছোট পাথরের মন্দিরের ভিতরে 'বিনায়ক' অর্থাৎ গণেশের কৃষ্ণবর্ণের মূর্তি রয়েছে। ক্ষণিকের বিরতি নিলাম এখানে। বেশ কিছু জায়গায় হাল্কা বরফের আস্তরণ। তাপমাত্রা আরও নিম্নগামী মনে হল। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ বসে থাকলে হাইপোথারমিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আবার হাঁটা শুরু করলাম বাগুয়াবাসার দিকে। দূরত্ব ১.৮ কিমি.। রাস্তা খুব খাড়াই নয়, তবে চারদিকে হাজার হাজার পাথরের ব্লক পড়ে রয়েছে। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে 'বাগুয়াবাসা'-য় পৌঁছলাম যখন, ঘড়িতে রাত তিনটে।

বাগুয়াবাসা হল রূপকুণ্ডে পৌঁছানোর শেষ ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। সব ট্রেকারই অন্তত একটা রাত বাগুয়াবাসাতে কাটায় উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে মানানোর জন্য। বাগুয়াবাসাতেও রয়েছে একটি অস্থায়ী ধাবা। বনদপ্তরের ফাইবার টেন্ট-এ ক্ষণিকের বিরতি ও হাল্কা খাওয়া দাওয়ার পর আবার হাঁটা শুরু করলাম শেষ গন্তব্য রূপকুণ্ডের পথে। গাইডরা বলতে থাকল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে হবে। বেলা বাড়লেই বরফ নরম ও পিচ্ছিল হতে শুরু করে। বাগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ডের দূরত্ব মাত্র তিন কিমি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে হিমালয়ের এমন অপরূপ নৈসর্গিক শোভা এই ট্রেক রুটের কোথাও আর দেখা যায় না। দিনের আলোয় এখান থেকেই জুনার গলি পাস ও রূপকুণ্ডের রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। চতুর্দিকে শুধু পাথর, কোথাও কোথাও মোটা বরফের চাদরের আস্তরণ - ক্যাম্প্রন পরে খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। প্রথম এক ঘন্টা হেঁটে 'ছিরিং'-এ পৌঁছালাম। এখান থেকে রূপকুণ্ডে ওঠা শুরু। বরফের ওপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে রাস্তা। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় খুব তাড়াতাড়ি দম শেষ হয়ে আসছে। কিছুটা এগিয়েই সকলকে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। আকাশের আলো-আঁধারি ভাব যখন কাটতে শুরু করেছে রূপকুণ্ড দেখা দিল চোখের সামনে। ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টির মধ্যে একটি বাটির মতো আকৃতির এই রূপকুণ্ড। সমস্ত কুণ্ডটি জমে এক নীলাভ বলয় সৃষ্টি করেছে। পাড় থেকে কুণ্ড পর্যন্ত মোটা বরফের আস্তরণ। দড়ি ও আইস-অ্যাক্স না থাকায় আমরা নিচ অবধি পৌঁছতে পারলাম না। তাই কুণ্ডের ওপর অংশে দাঁড়িয়েই তার অপরূপ শোভাকে চোখ ভ'রে উপলব্ধি করলাম। বছর দু-তিন মাস ছাড়া সর্বদাই বরফ জমে থাকে এই কুণ্ড। চারদিকে প্রচুর বরফ থাকায় সেই বহুচর্চিত নরকঙ্কালগুলোও দৃশ্যমান হল না। শুধু একটি পাথরের ওপর একটি খুলি ও কিছু হাড়-গোড় দেখেই মনকে সান্ত্বনা দিলাম। বহু কষ্ট করে পৌঁছনো সেই আকাঙ্ক্ষিত রূপকুণ্ডকে ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। কিন্তু ফের প্রকৃতির ভ্রূকুঞ্চন দেখে আর সময় নষ্ট না করে ফেরার পথ ধরলাম।

কি কি নেবেন -

যেকোন ট্রেক এর জন্য ব্যাকপ্যাক খুব জরুরী। মনে রাখতে হবে তাতে যেন চলার পথের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস থাকে ও সবমিলিয়ে ওজন দশ কেজির মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি তালিকা দেওয়া হল -

১) ব্যাকপ্যাক যেন পঞ্চাশ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ব্যাগ কভার বা প্লাস্টিক সিট থাকা দরকার।

২) স্লিপিং ব্যাগ, ইনার সহ (ভাড়া পাওয়া যায়)।

৩) ক্যাম্পিং টেন্ট, স্লিপিং ম্যাট্রেস (ভাড়া পাওয়া যায়)।

৪) হাই অ্যাঙ্কেল, ওয়াটার প্রুফ, ভালো গ্রিপিং ও হাল্কা জুতো। (উদাহরণ- Quecha, Forclaz-500)।
5) স্লিপার, ক্যাম্প্রন (বরফের উপর হাঁটার জন্য), তিন জোড়া উলেন মোজা।
৬) ১০০% UV প্রোটেক্টেড সানগ্লাস, সান ক্রিম, বোরোলীন বা কোল্ড ক্রিম, সাবান, স্যানিটাইজার, ভেজা বা শুকনো টিস্যু।
৭) ওয়াকিং স্টিক (ভাড়া পাওয়া যায়)।
৮) ছুড়ি ও দড়ি, পলিথিন (আবর্জনা এক জায়গায় রাখার জন্য) ফেভিকুইক, সেফটিপিন, কর্পূর।
৯) জোরালো টর্চ ও হেড ল্যাম্প।
১০) দু/তিন জোড়া হালকা জামা কাপড়, ট্র্যাক সুট, ফুল সোয়েটার, কান ঢাকা টুপি বা বালাকোভা, থার্মোকট, ওয়াটারপ্রুফ গ্লাভস, ফেদার জ্যাকেট (ভাড়া পাওয়া যায়) উইঞ্চিটার, পঞ্চো অথবা রেনকোট।
১১) খাবারের মধ্যে - শুকনো ফল, বিস্কুট, গ্লুকোজ, লজেন্স, বাদাম, ছোলা, ছাতু। এছাড়া অস্থায়ী ধাবায় খাওয়া দাওয়া গোটা রুট জুড়েই আছে।
১২) ওষুধ: - কম্বিফ্লেম, র‍্যান্ট্যাক-১৫০, ক্রেপ ব্যান্ডেজ, ব্যান্ড এড, ডাইজিন, কটন বল, ও.আর.এস., মেট্রোজিল, নরফ্লক্স, স্যারিডন, ভলিনি স্প্রে বা বাম, মাসল রিল্যাক্সেন্ট মেডিসিন (মায়োস্পেস), কোকা-৬০, প্যারাসিটামল, বেটাডাইন লোশান, ডেটল। এছাড়া কেউ যদি কোন ওষুধ আগে থেকে ব্যবহার করে থাকেন, তা অবশ্যই সঙ্গে নেবেন। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে ভুলবেন না।
১৩) ক্যামেরা ও ক্যামেরার বাড়তি ব্যাটারি ও পাওয়ার ব্যাঙ্ক
১৪) নৈনিতাল ও আলমোড়াতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এটিএম আছে। তাই প্রয়োজনীয় টাকা সেখান থেকে তুলে নেওয়া ভালো। এর ওপরের ছোট জনপদের এটিএমগুলোতে লিঙ্ক ফেলিওরের সম্ভাবনা থাকে।

কিভাবে যাবেন -
হরিদ্বার থেকে ওয়ানের দূরত্ব: ৩০০ কিমি, বাসে যেতে সময় লাগে মোটামুটি বারো ঘণ্টা
* বাস সার্ভিস ঋষিকেশ থেকে লোহারজং-এর মধ্য দিয়ে ওয়ান পর্যন্ত। ছাড়ার সময়ঃ- উভয় জায়গা থেকেই ভোর 4.00 টে।
ড্রাইভারের ফোন নম্বরঃ 07361720082/09760220082

লালকুঁয়া থেকে ওয়ানের দূরত্ব ২৬০ কিমি, সময় লাগে মোটামুটি দশ ঘণ্টা
শেয়ার জিপ ভাড়া পাওয়া যায় হালদিয়ানি থেকে দিয়াল (ভায়া গোয়ালদাম)। দিয়াল থেকে লোহাজং যাওয়ার বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। দিয়াল থেকে বাস ছাড়ে বিকেল 4.30 টে এবং ওয়ান-এ পৌঁছায় সন্ধ্যা 6.30 টা। দিয়াল থেকে শেয়ার জিপও ভাড়া পাওয়া যায়। গাড়ি বুকিং-এর জন্য সরাসরি ফোন করতে পারেন - মহেশ, ফোনঃ- 09410556851 /09557436527
* প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা ধসের জন্য সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে। তাই আগে থেকে বাস বা গাড়ির ড্রাইভারের সাথে কথা বলে রাখাই ভালো।

কোথায় থাকবেনঃ-
লোহারজং-এ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে পিঠে থাকার জায়গা অনেকগুলোই আছে। ওয়ানে হোটেল/হোম স্টে ছাড়াও গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের ডরমেটরি ট্রেকারস হাটও রয়েছে, জিএমভিএন ওয়েবসাইটে গিয়ে আগে থেকে বুকিং করা যায়। এছাড়া দুটি ফরেস্ট হাটও রয়েছে। বাকী ট্রেকপথে নিজেদের তাঁবু নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। গাইডকে জানিয়ে রাখলে সেও আগে থেকে তাঁবুর ব্যবস্থা করে রাখে।

রূপকুণ্ড ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি - ১ - ২

বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত অনিরুদ্ধের ছোটবেলা থেকেই নানান ভ্রমণ পত্রিকা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জিম করবেট পড়ে, বিভিন্ন লেখায় বর্ণিত জায়গাগুলিকে দেখার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন কলেজে উঠে। ২০০৫ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে তথা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও কর্মসূত্রে বিদেশের এমন অনেক জায়গা দেখেছেন, যার নাম হয়তো কম মানুষই শুনেছেন। জীবনে খুব সহজ তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস করেন - যা দেখব, যা শিখব এবং যা খাব - তাই-ই সঙ্গে যাবে, বাকি সব এই পৃথিবীতেই পড়ে থাকবে। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্রের অমোঘ টানে নিরন্তর ছুটে চলেছেন।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

দিন তিনেকের ভুটান

সম্পত ঘোষ, সায়ন্তিকা ঘোষ

~ ভুটানের তথ্য ~ ভুটানের আরও ছবি ~

ভুটান সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ছিল দীর্ঘদিনের। হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটা দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রশান্তি মুগ্ধ করে। কোনও জনজাতির জীবনধারণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ অসীম, তবে ভুটান দেশটার যা সবথেকে বেশি টানে সেটা হল এদেশে উন্নতির মাপকাঠি জিডিপি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশনে নয় বরং নাকি গ্রস হ্যাপিনেস ইনডেক্সে মাপা হয়। এ তো গেল আমাদের একজনের কথা। আর অন্যজনের টানটা হিমালয়ের ভূতত্ত্বে। আকর্ষণের ক্ষেত্র আলাদা হলেও গন্তব্যটা মিলে গিয়েছিল। কাজেই মাত্র পাঁচদিনের ছুটিতে গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে দুজনে বেরিয়ে পড়েছিলাম ভুটানের উদ্দেশ্যে।

ফুন্টশোলিং (Phuentsholing) যখন পৌঁছলাম, বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। ওপার থেকে যারা দিনে কাজ করতে বা কোনও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ফিরে গেছেন দিনান্তে, নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যস্ততাও অনেক কমে গেছে। ছোট্ট কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত আর হট্টগোলে অভ্যস্ত একটা জনপদ এখন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরাও, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে ফুন্টশোলিং পৌঁছতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছিল। ট্যাক্সিচালক বিপুলের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হোটেলে উঠলাম। আমাদের আজকের ঠিকানা হোটেল ডামচেন।

পর্বতের ভূ-চরিত্রের বিভিন্নতা

ভুটান নামটার উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। তিব্বতী আর এখানকার অধিবাসীদের কাছে এটি অনেক নামে পরিচিত ছিল যেমন লো য়্যুল (Lho Yul - যার অর্থ দক্ষিণের দেশ, কারণ এটি তিব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত), মেন জং (Men Jong - ওষধি ভূমি), মঁয়্যুল (Mon Yul - অন্ধকারের দেশ কারণ এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তখনও বিশেষ প্রচার পায়নি), লো মঁ খা-জি, সেনদেন জং (Lho Mon Kha - zhi, Tsenden Jong - এসেন্স বা ধূপের ভূমি)। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে ভুটান কথাটি এসেছে ভারতীয় শব্দ 'ভুটিয়া' (Bhutia/Bhutea) কিংবা নেপালি শব্দ 'ভোটে' (Bhotay) থেকে। কিছু ভারতীয় এবং অ-তিব্বতীয় লেখায় 'ভোতান্তা' (Bhotanta) কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কিছু ভুটানি বিদ্বজ্জন মনে করেন ভুটান নামটি এসেছে বুমথাং (Bumthang) থেকে। বুমথাং ভুটানের মধ্যভাগে অবস্থিত। গাওয়াং নামগিয়াল (Ngawang Namgyal)-এর পূর্ববর্তী সময়ে তিব্বতীয় লেখায় ভুটান (Bhutan) বা ড্রুক য়্যুল (Druk Yul)-এর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়না বরং বুমথাং-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দীর্ঘ রেফারেন্স আর ইতিহাস হাতড়াতে হাতড়াতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতেও পারিনি।

অনেক ভোরে ঘুম ভাঙল। ভুটানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এই ফুন্টশোলিং। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ভারত থেকে ভুটানের প্রবেশপথ, তবে ভারতীয়দের ফুন্টশোলিং অবধি যেতে ভিসা কিংবা পারমিট দরকার হয়না, এর আগে যেতে গেলে লাগে। আমরা যাব থিমফু (Thimphu), তাই ফুন্টশোলিং থেকে পারমিট বের করতে হবে। ইমিগ্রেশন অফিস সামনেই। ফর্ম পূরণ করে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হল। সাহায্য দরকার মনে হতেই পেয়ে গেলাম অবনীশকে, বায়োমেট্রিক ইত্যাদিতে আর বেশি সময় লাগল না, পারমিট হাতে এবার গাড়ি খোঁজার পালা। অবনীশ যোগাযোগ করিয়ে দিল অনিলদার সঙ্গে। অবনীশ, অনিলদা দুজনেই নেপালি, বাংলাও ভালো বলতে পারে, গেট পার হয়েই জয়গাঁওতে বাড়ি। ভারত আর ভুটান সীমান্তে অবস্থিত জয়গাঁও ভারতের প্রান্তীয় জনপদ, পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত। মূলত বাঙালি আর নেপালি জনবসতি। থিমফুর উদ্দেশ্যে আমাদের রওনা হওয়ার কথা বেলা একটায় আর এখন এগারটা বেজে গেছে। ব্রেকফাস্ট করা হয়নি, স্নান সেরে লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। খাওয়ার সময় ছিলনা, তাই বেঁধে নিয়ে রওনা হলাম থিমফুর উদ্দেশ্যে। পরোটা, তন্দুরি চিকেন আর রায়তা। অনিলদা একটু লেট করেছিল। রওনা হলাম তখন প্রায় দেড়টা।

তোর্সা নদীর পাশ দিয়ে গাড়ি চলল, রাস্তাটা পিচের নয়, কাঁচা। কাজেই গাড়িও চলল হেলতে দুলতে। তোর্সা স্থানীয় লোকেদের কাছে আমু ছু (Amo Chhu) নামে পরিচিত। তিব্বতের চুম্বি ভ্যালি থেকে তোর্সার উৎপত্তি। মোট ৩৫৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ১১৩ কিমি পথ চিনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত আর ১৪০ কিমি ভুটানের মধ্যে দিয়ে। আমু ছু খুব সুন্দর, অনেকটা ছবির মতন, তবে বেশ খরস্রোতা। আমাদের গাড়ির পারমিট

চাষবাস

বের করতে হবে যদিও সেটা অবনীশ আর অনিলদার দায়িত্ব। গাড়ি থামিয়ে শুরু হল তোর্সার সঙ্গে আমাদের ফোটোসেশন। যতটা পারা যায় ক্যামেরার লেন্সে বন্দি করা। একটু দেরি হল, তা হোক, কিন্তু তোর্সার স্মৃতি সঙ্গে নেবনা সেটাতো আর হয়না। এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তা শেষ হল, পৌঁছলাম ভুটান সরকারের অফিসে। গাড়ির পারমিট বের করতে প্রায় আধঘন্টা লাগল। অবনীশকে বিদায় জানিয়ে এবার পিচরাস্তা ধরল গাড়ি।

আমাদের সঙ্গে খাবার আছে, আর সকাল থেকে আপেলের জুস ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয়নি। তোর্সা বেশ ভুলিয়ে রেখেছিল। অনিলদা কিছুই খেতে চাইল না, শেষপর্যন্ত একটু নিল। খাওয়া, গল্প আর গান শোনা - পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলাম উঁচুতে। লিথোটেক্টোনিক ম্যাপ, মেটামরফিক অবসেরভেশন, সেডিমেন্ট সিরিজ ইত্যাদি নানান তথ্য উঠে এল পথ চলতে চলতে। একজন শ্রোতা, আর একজন বক্তা। ভূতত্ত্ববিদেরা গবেষণায় জানিয়েছেন যে মিয়োসিন যুগের লিউকোগ্র্যানাইটের (Leucogranite) চাদরটি দক্ষিণ তিব্বতীয় বিচ্যুতির সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু ভুটান দেশের দক্ষিণভাগে সেটা ধীরে ধীরে কমে গেছে। ভুটানের ভূতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য পেলাম। ভুটানে বৌদ্ধধর্ম প্রধানত তিব্বত থেকেই প্রচার পায়, ভুটানকে ধর্মীয় ও শিক্ষিত করে এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে গড়ে ওঠার অনুপ্রেরণা দেয়। পরবর্তীকালে সতেরোশো শতকে অন্তত চারবার তিব্বত মোঙ্গলদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ করে ভুটানকে, যদিও চারবারই তারা জহাবদ্রুং (Zhabdrung) এর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়।

থিমফু শহর

পাহাড়ের রাস্তার বাঁকে এক বয়স্ক মহিলা কমলালেবু বিক্রি করছেন, প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে ভরে রাখা। সাইজ অনুযায়ী দাম। আমরাও একটা টুকরি কিনলাম দুশো টাকা দিয়ে। ভুটানে ভারতীয় মুদ্রা চলে। এটা অবশ্য হোটেলেও দেখছি। আমরা এখনও পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রাই দিয়েছি, তবে ব্যালান্সটা ভুটানী টাকায় (Bhutanese ngultrum) ফেরত দিয়েছে সব জায়গায়। দুটো মুদ্রার বিনিময় মূল্য এক, তাই কোনও অসুবিধা হয়নি। কমলালেবু খেতে খেতে চললাম তিনজনে। খোসাগুলো রাস্তায় ফেলিনি, প্রকৃতি তার সৌন্দর্য্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে। মুগ্ধ হচ্ছি আমরা। অনিলদা হাতের তালুর মতন চেনে ভুটান, তবুও প্রতিবারের মতন এবারেও সে আবার প্রেমে পড়ছে। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে ফটো তুলছি, অনিলদারও কোনও ক্লান্তি নেই।

ভুটানের বিভিন্ন ডিশ। রেড রাইস, সামু দাতসি, জাসা মারু (বামদিকের ছবি); কোনিজি (ডানদিকের উপরের ছবি); পারো-র রেস্তোরাঁর লাঞ্চ প্লেট (ডানদিকের নিচের ছবি)

আঁধার হয়ে আসছে। একটু তাড়াতাড়িই সন্ধে নেমে এল। আগেই হোটেলে ফোন করে রিজারভেশন করে রেখেছিলাম। একটু মুশকিল হল হোটেল 'ওসেল' খুঁজতে। আসলে খুব পুরোনো নয় বলেই অসুবিধাটা হল। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ হল না আর আমাদের ইন্টারনেট আর ফোনটাও চলছিল না। শেষে ল্যাপটপে সেভ করে রাখা ঠিকানাটা দেখে পেয়ে গেলাম। অনিলদার ঠিকানা আলাদা। আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। এবার আজকের মতন ডিনার সেরে ঘরে ঢুকে বিশ্রাম। রেড রাইস আর জাসা মারু (Jasha Maru) আমাদের ডিনার। এই রেড রাইস হল একধরণের weedy রাইস। ভুটানের নিম্ন উচ্চতায় ইন্ডিকা আর উচ্চ উচ্চতায় জাপোনিকা ধানের চাষ হয়। শুনলাম, রেড রাইস-এর ঔষধি গুণ আছে। জানি রেড রাইস বেশি মাত্রায় মিনারেল ধারণ করে যা শরীরের জন্যে সাধারণত ভালো, কিন্তু অধিক তথ্য জানা নেই। হোটেলের শেফের কাছে শুনলাম এটি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়, টেস্টটা দুজনেরই খুব ভালো লেগেছিল। জাসা মারু হলো মশলাদার চিকেন।

ঘুম ভাঙল যখন, নরম রোদ বিছানায় এসে পড়েছে। উঠতে হবে। ব্রেকফাস্ট করে লাউঞ্জে এসে দেখি অনিলদা ঠিক সময়ে এসে গেছে। সেই আমাদের গাইড। প্রথমেই গেলাম ন্যাশনাল মেমোরিয়াল চোর্তেন । ভুটানের ভাষা Dzongkha, বাংলায় উচ্চারণ দাঁড়ায় 'জনক্যা'। Dzongkha ভাষায় চোর্তেন কথাটার অর্থ বৌদ্ধ স্তুপ বা বৌদ্ধ মন্দির। ন্যাশনাল মেমোরিয়াল চোর্তেন শহরের দক্ষিণ-মধ্যভাগে দোয়েবুম লাম (Doeboom Lam)-এর ওপরে অবস্থিত। ফলকের লেখা তথ্য থেকে জানলাম ১৯৭৪ সালে মহারানি ফুন্টশো চোদেন ওয়াংচুক (Phuntsho Choden Wangchuck) ও তাঁর পুত্র তৃতীয় ড্রুক গিয়ালপো (Druk Gyalpo) মহারাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুক (Jigme Dorji Wangchuck ১৯২৮-১৯৭২)-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি স্থাপন করেন। বর্তমান ভুটানের জনক এঁকেই বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কস্থাপনে বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছিলেন জিগমে দোরজি ওয়াংচুক। ভুটানের দূরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে সড়কপথে যোগ, দূরাভাষ-এর মাধ্যমে যোগাযোগ, সংবাদ মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

তারপর কুয়েনসেলফোদরাং নেচার পার্ক (Kuenselphodrang Nature Park)। এর একদম হিলটপে স্থাপিত বৌদ্ধস্তূপ, এটি বুদ্ধ দর্দেনমা নামে পরিচিত। সোনার জলকরা ব্রোঞ্জের শাক্যমুনির মূর্তিটি উচ্চতায় সাড়ে একান্ন মিটার। খুব খারাপ লাগল যে আমরা টাকিন প্রিজার্ভ সেন্টারটি দেখতে পেলাম না। শুনলাম কিছুদিন আগে কোনো অজ্ঞাত কারণে বেশ কয়েকটি টাকিন মারা গিয়েছে, তাই কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য সেন্টারটি বন্ধ রেখেছেন। টাকিন ভুটানের জাতীয় পশু। টাকিনকে নিয়ে বিভিন্ন কাহিনির প্রচলন আছে, যেমনটা থাকে নানান দেশে - মিথ। তার সত্য মিথ্যা যাচাই করা নিতান্তই অহেতুক। প্রাণীটির বর্তমান অবস্থা সংকটজনক। কিছু করার নেই, বাকি থেকে গেল দেখা।

বুদ্ধ দর্দেনমা, কুয়েন্সেল ফোদরং নেচার পার্ক

ন্যাশনাল টেক্সটাইল মিউজিয়াম। এটি রয়্যাল টেক্সটাইল একাডেমির একটি অংশ। মিউজিয়ামটি নরজিন ল্যামে - আমাদের হোটেলের থেকে হাঁটা পথে, তাই লাঞ্চ সেরেই বেরিয়ে পড়লাম। ছবি তোলা নিষেধ। জাতীয় টেক্সটাইল মিউজিয়ামের গ্রাউন্ড ফ্লোরটিতে রয়েছে রাজপরিবারের ব্যবহৃত পোশাক আর ওপরের ফ্লোরে আধুনিক উইভিং টেকনিকের প্রদর্শন। ছেলেদের পোশাকের নাম 'ঘো' (Gho), জাপানি পোশাক কিমোনোর সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য আছে তবে ঘো লম্বায় শুধু হাঁটু পর্যন্ত হয়ে থাকে আর ঐতিহ্যপূর্ণ বেল্ট যার স্থানীয় নাম 'কেরা' (Kera) দিয়ে কোমরের কাছে বাঁধা থাকে। মেয়েদের পোশাকের নাম 'কিরা' (Kira) যা লম্বায় গোঁড়ালি পর্যন্ত আর কিরার ওপরে যে জ্যাকেট থাকে তার ওপরের লেয়ারকে তেগো আর নিচের লেয়ারকে ওজু বলা হয়। এটিই ভুটানের জাতীয় পোশাক। জং (Dzong - যার মূল অর্থ fortress বা দুর্গ, সাধারণভাবে সরকারি কার্যালয় অর্থে ব্যবহৃত হয়) বা প্রশাসনিক কার্যালয়ে প্রবেশ করার সময়ে এঁরা স্কার্ফ পরেন। ছেলেদের স্কার্ফ 'কাবনে' (Kabney) আর মেয়েদের স্কার্ফ 'রাচু' (Rachu) নামে পরিচিত তবে রাচু কাঁধ থেকে ঝোলানো থাকে যা কাবনের থেকে অনেকটা আলাদা। কাবনের রং প্রশাসনিক পদ বা গুরুত্ব অনুযায়ী হয়ে থাকে। রাচু বেশ রংবেরঙের ও কারুকার্যসমন্বিত হয়। শুনেছি পূর্ব ভুটানের কিছু জনজাতি যেমন ব্রামিস কিংবা ব্রোকপা সম্প্রদায়ের মানুষ আলাদা ধরণের পোশাক যা প্রধানত চমরিগাই বা ভেড়ার লোমের তৈরি, ব্যবহার করেন। তবে আমাদের হাতে একেবারেই সময় না থাকার জন্যে যাওয়া হয়নি এবার।

সারাদিনের কার্যকলাপ: স্থানীয় হস্তশিল্পের বাজার, থিমফু (উপরের সারি), সাইক্লিং করে পাটকের বেশভ্রমণ (নিচের সারির বামদিকের ছবি), রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু কসরত (নিচের সারির মাঝখানের ছবি), পারো-চু-র ঠান্ডা জলের স্পর্শ (নিচের সারির একদম ডানদিকের ছবি)

বিকেলে স্থানীয় বাজার দেখতে গেলাম। লঙ্কার আচার, কমলালেবুর শুকনো খোসা আর আদার ক্যান্ডি আর কোর্ডিসেপ্স টি (Cordyceps Tea) এই তিনটি জিনিস ছিল আমাদের কেনাকাটার তালিকায়।

হোটেলে ফিরে ডিনার। নতুন কিছু স্থানীয় খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সামু দাতসি (Shamu datshi), এমা দাতসি (Ema datshi), কেয়া দাতসি (Kewa datshi) ইত্যাদি ভুটানি ডিশ। 'দাতসি' কথাটির স্থানীয় অর্থ চীজ, যেমন সামু দাতসি হলো মাশরুম চীজ , এমা দাতসি চিলি চীজ আর কেয়া দাতসি হলো আলু চীজ। প্রায় নয় ধরনের মাশরুমের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো মাৎসুতাকে (Tricholoma matsutake), স্থানীয় ভাষায় যার নাম সাঙ্গে শামোং (sangey shamong, Shamong এর অর্থ মাশরুম)। বুনো মাশরুম সংগ্রহ আর বিক্রি স্থানীয় জনজাতির একটি অন্যতম আয়ের উৎস। যাইহোক, আমরা ভালোই উপভোগ করলাম ভুটানি ডিশ। এমনকি শেফের কাছ থেকে শিখেও নিলাম সামু দাতসি-র রেসিপি আর বানানোর কৌশল।

ঘুম থেকে তাড়াতাড়িই উঠে পড়লাম। অনেক ভেবেছি সারারাত। নাহঃ, পারো (Paro) ঘুরেই যাব। হয়ত দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা হবেনা, সে নাই হোক, প্রকৃতিকে তো অনুভব করা যাবে। অনিলদার একটি মহৎগুণ যে, খুব সময়ানুবর্তী। ব্রেকফাস্ট সেরেই তাকে জানালাম পারো যাবো, অনিলদা রাজি। কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লাম। থিমফু ছাড়িয়ে গাড়ি চলল পারোর দিকে। পাহাড়ের চরিত্র পাথুরে, বেশিরভাগই ন্যাড়া। উচ্চতা অনুযায়ী ছ রকমের অ্যাগ্রো-ইকোলজি জোন দেখা যায় ভুটানে। অ্যালপাইন (> ৩৫০০মি), কুল টেম্পারেট (২৫০০-৩৫০০ মি), ওয়ার্ম টেম্পারেট (১৮০০-২৫০০মি), ড্রাই সাবট্রপিকাল (১২০০-১৮০০ মি), হিউমিড সাবট্রপিকাল(৬০০-১২০০ মি) আর ওয়েট সাবট্রপিকাল (১৫০-৬০০ মি)। তবে আমরা শুধু থিমফু (উচ্চতা ২৩৩৪ মিটার) আর পারো (উচ্চতা ২১৯৫ মিটার) ঘুরেই চলে যাব এবার। বাকিটা তোলা থাকল ভবিষ্যতের জন্যে। চলতে চলতে চোখে পড়ল পেলহিল স্কুল (Pelkhil School), অনেকটা হলিউডের স্টাইলে পাহাড়ের গায়ে লেখা।

কখন আমাদের চলার পথে সঙ্গী হয়ে গেছে পারো ছু (Paro Chhu)। পারো ছু -র উৎপত্তি তিব্বতের চোমো লারি (Chomo Lhari)-র দক্ষিণ ভাগ থেকে। অনিলদা গাড়ি রাখল নদীর পাড়ে, কী ঠান্ডা জল! অনেকেই নেমেছেন দেখলাম, আলাপ হল এক বাংলাদেশি দম্পতির সঙ্গে। ওঁরা এসেছেন ফ্লাইটে পারো বিমানবন্দরে। ভুটানে একটিই বিমানবন্দর আর সেটা পারোতে। বিমানবন্দরের জন্যে একলপ্তে অতটা সমতল ভূমি পাওয়া বোধহয় থিমফুতে সম্ভব নয়। প্রথম এটি গড়ে ওঠে ১৯৬৮ সালে, ভুটান সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় আর্মি হেলিকপ্টার ওঠানামা করত, পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে এটিই পুরোমাত্রায় এয়ারপোর্ট হিসেবে কাজ শুরু করে। ভুটান সরকার সিভিল এভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করে ১৯৮৬ তে, এয়ারপোর্টটিও আয়তনে বাড়ে। এখন শুনলাম ভুটান এয়ারলাইন্স, ড্রুক এয়ার, বুদ্ধা এয়ার, তাশি এয়ার - এরা অপারেট করে। ওঁদের বিদায় দিয়ে আমরা ফিরে এলাম গাড়িতে। হাতে আমাদের সময় যে বড়ই অল্প। ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ড্রুকগিয়াল জং (Drukgyel Dzong) কোনোটাই আমাদের দেখা হলোনা। তাকসাং মনাস্ট্রিও (Taktsang Monastery) বাদ থেকে গেল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩১২০ মিটার উচ্চতায় এই মনাস্ট্রি। উপরে ওঠার সময় পেলাম না, নীচ থেকেই ফিরে আসতে হল, আলো পড়ে যাওয়ার আগে ফুন্টশোলিং পৌঁছতে হবে। পরেরবার এলে পারোকে কেন্দ্র করেই কাটাবো দু-তিন দিন। পথে ভালোলাগা একটা হোম স্টের যোগাযোগ নম্বর নিয়ে এসেছি। পাহাড়ের উপত্যকায় চাষ আবাদ হয়, শুনলাম এখানেই রেড রাইস চাষ হয়, বাইরেও রফতানি হয়। খুব খিদে পেয়েছে। শহরের প্রায় মধ্যভাগে একটি পরিবার রেস্তোরাঁ খুলেছেন, একদম ঘরোয়া, বুফে। আমরা যখন পৌঁছলাম তখনও রেডি হয়নি। একটু অপেক্ষা করলাম। ভাত, চিকেন, স্কোয়াশ আর ব্রকোলি সিদ্ধ, আলুভাজা ইত্যাদি ছিল। অনেক রাত হল ফুন্টশোলিং পৌঁছতে। অনিলদা খুব দক্ষ গাড়িচালক। প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল রাস্তায়। জীবনের অনেকটা সময় ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলে কাটিয়েছি, প্রচন্ড বৃষ্টিতে প্রায়ই পাহাড় ধ্বসে

রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা অনেক আছে। তবে এবার কোনও অসুবিধা হয়নি। শুধু একটু সময় বেশি লাগল। পারমিটের কাগজ জমা দিয়ে আমরা ঢুকলাম ফুন্টশোলিং। এবার বিশ্রাম, আবার ঠিকানা দামচেন। আসতে আসতে যতটা রাত বলে মনে হচ্ছিল ততটা নয়, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। কাজেই আজকের ডিনার জয়গাঁওয়ে।

পারো ছু-র পাশ দিয়ে পারো যাওয়ার পথে

আজ অন্তিম দিন ভুটান ঘোরার। আমাদের গন্তব্য ঘড়িয়াল সংরক্ষণ প্রকল্প। এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট মিনিস্ট্রির অধীনে ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড পার্ক সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে এটি কাজ করে। জানলাম ১৯৭৬ সালে খুব ছোট ভাবে এটি তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে ২০০৩ সালে নেচার কনসারভেশন ডিভিশন আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের তত্ত্বাবধানে এর উন্নতিসাধন হয়। ছোটো ছোটো পুকুরে তাদের রাখা হয়েছে, মোটা তারজালির বেড়া দিয়ে ঘেরা। ব্রিডিং করিয়ে বড়ো করে তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় প্রাকৃতিক বাসস্থানে। যদিও ১৯৯৮ সালের তথ্য, ভুটান এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে যারা সবথেকে বেশি অনুপাতে জমি বরাদ্দ করেছিল প্রোটেক্টেড এরিয়ার জন্যে, মোট ভূভাগের প্রায় ২৬.৩ শতাংশ জাতীয় উদ্যান (National Park) আর সংরক্ষিত অরণ্যের (Sanctuary) জন্যে ব্যবহার হয়।

শাক্যমুনি-র দেশ ভুটান। ন্যাশনাল মেমোরিয়াল চোর্তেন (প্রথম সারির তিনটি ছবি); একটি বুদ্ধ মনাস্ট্রি (মাঝের সারির তিনটি ছবি); পারো জংখাগ ব্রিজের পাশে একটি প্রার্থনাস্থল (নিচের সারির বামপাশের ছবি); ফুন্টশোলিঙের মনাস্ট্রি (নিচের সারির ডানদিকের দুটি ছবি)

এবার ফিরতে হবে। হোটেল থেকে বেরিয়ে একজন ভুটিয়ার সঙ্গে দেখা হল। প্রশ্ন করলাম, তার 'ঘো' তে যে বর্তমান রাজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংচুক (Jigme Khesar Namgyel Wanchuck - পঞ্চম ড্রুক গিয়েলপো) আর রানি গিয়েলতসুয়েন জেতসুন পেমা ওয়াংচুক (Gyeltsuen Jetsun Pema Wangchuck)-এর ছবিওলা ব্যাজ লাগানো সেটা কি নিয়ম? উত্তরে সে বলল যে সে এটা তার রাজার প্রতি ভালোবাসা থেকে লাগিয়েছিল। এই একই প্রশ্ন আমার মনে অনেকবারই এসেছিল রাস্তায়, দোকানে, হোটেলে রাজা-রানির অনেক ফটো দেখে, করেওছিলাম, উত্তরের ভিন্নতা পাইনি, খুব ভালো অনুভূতি হল।
তাশি দোরজির (Tashi Dorji) একটা লেখা 'দ্য স্টোরি অফ আ কিং, আ পুওর কিং, আ পুওর কান্ট্রি অ্যান্ড রিচ আইডিয়া' ('The story of a king, a poor country and rich idea' http://earthjournalism.net/stories/6468), লিঙ্কটা দিলাম যদি কারোর পড়তে ইচ্ছে করে। এখান থেকেই জানি যে গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস আইডিয়াটা বর্তমান রাজার বাবা চতুর্থ ড্রুক গিয়েলপো জিগমে সিংজে ওয়াংচুকের (Druk Gyelpo Jigme Singye Wangchuck)।
মাত্র তিন দিনের ভুটান সত্যি মনের অনেকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে আর তাই হয়ত সাত মাস পরে যখন লেখাটার সময় পেলাম তখন মনে করতে হলনা কিছুই, ছবিগুলো এমনিই ভেসে উঠল চোখের সামনে। এবারের মতন বিদায়, কিন্তু আবার আসব। হ্যাপিলি।

থিমফু শহর

~ ভুটানের তথ্য ~ ভুটানের আরও ছবি ~

ভূ-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন সায়ন্তিকা ঘোষ, সুযোগ পেলেই পাহাড়ের হাতছানিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতন সাড়া দেন। ভালোবাসেন রান্না করতে আর ফটো তুলতে। সম্পত ঘোষ আগ্রহী বিভিন্ন জনজাতির জীবন আর জীবিকা বিষয়ে জানতে। ভালোবাসেন সাইকেল চালাতে, বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করতে আর প্রবন্ধ পড়তে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

কুকুবুরু পাহাড় ও সোনকুপির অরণ্য

সায়ন ভট্টাচার্য

"সবাই বলে রুক্ষ পুরুলিয়া - ধূসর পুরুলিয়া কিন্তু আমি বলব সবুজ পুরুলিয়া" - গল্প হচ্ছিল সুজিতদার সঙ্গে। কোথাও আক্ষেপ আবার কোথাও বা গর্ব। সেই গর্বের আনন্দটুকু ভাগ করে নিচ্ছিলাম আমরা। আমরা বলতে শুভ্রা, প্রবীর, শিপ্রা, নিলয়দা, রাকা, শুভ্রজ্যোতি, চন্দনা আর আমি। সত্যিই সবুজ পুরুলিয়া। শাল-পিয়াল, মহুয়া-শিরীষের বনে ঘেরা পুরুলিয়া আর পুরুলিয়ার সেই বুনো স্বাদ পেতে এবারের গন্তব্য সোনকুপি।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার। রাত এগারটায় ট্রেন ছেড়ে পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় বরাভূম। বরাভূম স্টেশন থেকে ১৮ কিমি দূরত্বে কুকুবুরু পাহাড়ের কোলে বনে ঠাসা উপত্যকা সোনকুপি। স্টেশন থেকে একটা গাড়ি ঠিক করে চটপট রুকস্যাকগুলো গাড়ির মাথায় বন্দী করে রওনা দিলাম। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে যেতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। দুপাশে উন্মুক্ত প্রান্তর। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হল যে, পাখি পাহাড় ও মাঠাবুরু ঘুরে তারপর সোনকুপি ঢুকব। সোনকুপির কিছুটা আগেই দিগারডি গ্রাম। সেখান থেকে ডানহাতি রাস্তা ধরে ১-১১/২ কিমি এগোলেই পাখি পাহাড়। বিখ্যাত শিল্পী চিত্ত দে ও তাঁর সহকারী শিল্পীরা সারা পাহাড় কুঁদে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন পাখির অবয়ব। এই কর্মযজ্ঞের নাম -"ফ্লাইট টু হারমোনি।" নীচের জঙ্গলে গাড়ি থামল। ট্রেকিং শুরু। শিল্পীদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। পথের পাশের প্রস্তরখণ্ডে টাটকা খোদাইকরা কারুকার্য। নির্বিঘ্নে বেশ কিছুটা ওঠার পর দেখি, পাহাড়টি এবার প্রায় নব্বই ডিগ্রি খাড়া হয়ে উঠে গেছে। ইতি টানলাম হাঁটায়। তবে আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, পাহাড়ের ওই খাড়া অংশেও শিল্পীরা কিভাবে অমন ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন!

সোনকুপি বানজারা ক্যাম্প

বেলা বাড়ছিল। সেই সঙ্গে খিদেও। তাড়াতাড়ি নেমে এসে সোনকুপির রাস্তা ধরলাম। পথে পড়ল মাটা - আদিবাসী গ্রাম। তবে অনেকটা দেরি হয়ে যাওয়াতে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে এলাম সোনকুপি বানজারা ক্যাম্প। আপাতত দুদিন এটাই আমাদের বাড়ি । খুড়ি, তাঁবু। কুকুবুরু ছাড়াও চারিদিকে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় আর সবুজ বনানী। আট বিঘা জমি নিয়ে বিশাল ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। ছোট বড় মিলিয়ে আধুনিক সুবিধাযুক্ত গোটা বিশেক তাঁবু। প্রচুর পলাশ গাছ। সব গাছেই ফুলের আগুন ধরে আছে। সেই আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে আছে সারা চত্বরে। দেখেই প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পৌঁছতেই বিশেষ এক ধরনের গামছা মাথায় বেঁধে দিয়ে উষ্ণ অভিবাদন জানাল ইন্দ্র। মন ছুঁয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম সেরে বেড়িয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে জায়গাটা ঘুরে দেখতে। ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড যেখানে শেষ, সেখান থেকেই কুকুবুরু শুরু। ট্রেক করে উঠলাম। বেশ উঁচুতে একটা প্রায় সমতল জায়গায়। যতদূর চোখ যায় জঙ্গল। কোথাও ঘন কোথাও পাতলা। কোথাও আবার বিস্তীর্ণ ফসলি জমি। তারই মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট বড় টিলা। হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল ফিঙে (Black Drongo), বাঁশপাতি Green Bee Eater), চিত্রদোয়েল(Indian Robin), নীলটুনি (Purple sunbird), নীলকণ্ঠ (Indian Roller), ইউরেশীয় কণ্ঠী ঘুঘু (Eurasian Collared Dove), বুলবুল (Red-vented Bulbul), সিপাহী বুলবুল (Red whiskered Bulbul), টিয়া (Rose ringed parakeet), শিকরা (Shikra), হটটিটি (Red-wattled Lapwing), ধলাগলা মাছরাঙা (White-throated kingfisher), গো বগা (Cattle Egret), সাদা বক (Great Egret), কুবো (Greater Coucal), খয়েরি হাঁড়িচাচা (Rouphus Treepie), ছাতারে (Jungle babbler), গোলাপি শালিক (Rosy sterling) ইত্যাদি পাখি।

সোনকুপির পথে

কুকুবুরু

কুকুবুরুর ঠিক পেছনেই মাঠাবুরু। দুই পাহাড়ের মাঝে সুর্যটাকে ডিমের কুসুমের মতো মনে হচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে স্থানীয়রা কাঠ-শালপাতা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছে। পাখিরাও বাসায় ফিরছে, আমরাও তাঁবুতে ফিরলাম। সন্ধ্যা নামল। সোনকুপি ঘোরার ছক কষছিলাম যখন, ভাগ্যদেবী যে অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন সেটা বেশ বুঝতে পারলাম। নিজেদের অজান্তেই আমরা এই জঙ্গলে এসে পড়েছি এক পূর্ণিমার রাতে। ভাবা যায়? সন্ধেটা অন্যরকম ভাবে কাটানোর সব ব্যবস্থাই মজুত ছিল। মহুয়া, বনফায়ার থেকে শুরু করে ছৌ নৃত্য। বলাবাহুল্য প্রকৃতির অকৃত্রিম এই আয়োজনের কাছে অন্যসব আয়োজন ফিকে হয়ে গেল নিমেষে।

বৃষ্টিতাঁবুর বাইরে চাঁদের নরম আলোয় দু-তিনটে খাটিয়া পেতে অস্থায়ী গ্যালারি বানিয়ে, বসে বসে প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম জ্যোৎস্নায় ভেজা সোনকুপির রূপ। মেঘমুক্ত আকাশ, কুকুবুরু মাথায় চাঁদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের পাহাড় যেন। আমরাও 'শংকর'-এর মতো দুঃসাহসিক কাজ করে বসলাম। এই জোছনা রাতে জঙ্গলে ঢুঁ মেরে আসার লোভ আর সামলাতে পারলাম না। মাত্র পনেরো মিনিট জঙ্গলে নাইট সাফারি, থুড়ি ট্রেকিং। কিন্তু রোমাঞ্চে ভরপুর। সরু পথ ধরে টর্চের আলো ফেলে ফেলে এগোচ্ছি। পাতার ওপর দিয়ে হাঁটার খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে ও চারদিকে ঝিঁঝিঁর ডাক। চাঁদের আলোয় জঙ্গল ভারী মনোরম লাগছিল। পাঁচ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে একটা উঁচু টিলায় উঠে পড়লাম। চাঁদনি রাতের জঙ্গল আর পাহাড়ের ওই রূপ এতোটাই বুঁদ করে দিয়েছিল যে ভুলে গিয়েছিলাম এই জঙ্গল একটি এলিফ্যান্ট করিডর। প্রায়ই দলমা থেকে হাতিরা নেমে এসে এখানে চড়ুইভাতি করে। এছাড়া বুনোশুয়োর, নেকড়ে, ভল্লুক, হায়নারা লুকোচুরি খেলে। আর আছে সজারু। এখন মজারু মনে হলেও, সম্বিৎ ফিরেছিল দূরে থাকা কোনও ময়ূরের আর্তনাদে। বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। তবে সে যাত্রায় সোনকুপির জঙ্গলের প্রহরীদের সঙ্গে মোলাকাত হয়নি।

মুরগুমা বাঁধের পাড়ে

রাতে ভোজনপর্ব সেরে, খোশমেজাজে গল্পগুজব করতে করতে পরের দিনের প্ল্যান ঝালিয়ে নিলাম। সোনকুপি থেকে আট কিমি গিয়ে বাঘমুন্ডি থেকে আরও ষোল কিমি অযোধ্যা পাহাড়। বাঘমুন্ডির তিন কিমি দূরে ছৌ গ্রাম -চড়িদা। চড়িদা থেকে আট কিমি দূরে নিরুপম প্রকৃতির মাঝে কয়রাবেড়া ড্যাম। অযোধ্যা থেকে ঘুরে আসা যায় তিরিশ কিমি দূরের মুরগুমা লেক।

গল্প চলেছিল অনেক রাত অবধি। উপাদেয় খাবারেও যেমন পরিমাণমত নুন না থাকলে বিস্বাদ লাগে, তেমনই শুভ্রা, প্রবীর, শিপ্রা, চন্দনা, নিলয়দা, রাকা, শুভ্রজ্যোতি ছাড়া সোনকুপি ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। নিলয়দা দুচাকায় সারা ভারত চষে বেড়ান। শুভ্রা চিত্রশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার। শিপ্রা আবৃত্তিশিল্পী ও অভিনেত্রী। চন্দনা রন্ধনশিল্পী। রাকা - ফোটোগ্রাফির পাশাপাশি লেখালেখিতে হাত পাকাচ্ছে। প্রবীর অত্যন্ত সৃজনশীল। নাট্যআলো ও মঞ্চভাবনাতে জুড়ি নেই। শুভ্রজ্যোতি বিজ্ঞানসাধনার পাশাপাশি দুর্দান্ত গিটারিস্ট। নিজগুণে সবাই সবাইকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। সবাই আমায় ভালোবেসে ক্যাপ্টেনবাবু বলে (টিনের তলোয়ারের কথা ভুলেও ভাববেন না) । আর আমি বোবা হয়ে যাই। এই গুণী সঙ্গীদের কাছে, এই বিরাট প্রকৃতির কাছে আমার নিজেকে নিঃস্ব ও ক্ষুদ্র মনে হয়।

কয়রাবেড়া বাঁধের জলাধার

বেসরকারি রপ্তানিকারক সংস্থায় হিসাবরক্ষক সায়ন ভট্টাচার্যের পেশাদারি জীবনের বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে প্রকৃতিপ্রেম ও সাংস্কৃতিক চর্চা। ছোট থেকেই নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে 'উত্তর-হাওড়া শিল্পীলোক' দলের সঙ্গে নাট্যাভিনয় ও পরিচালনার কাজে যুক্ত। গতানুগতিক ভ্রমণ নয়, খোঁজ চলে অনাঘ্রাত পশ্চিমবঙ্গে কিংবা বাইরে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher